শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্—কলিকাতা।

১৩০৪

উৎসর্গ।

৺ হরিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলেষু—

যখনই কলম ধরি, তখনই আপনার কথা মনে হয়। এ লোকে থাকিলে আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আপনি কতই প্রীত হইতেন! স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে,—সুতরাং আপনার প্রীতিকর হইবে আশায়, এ গ্রন্থ আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী

শ্রীচন্দ্রোদয় দেবশর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

চিন্তা-লহরী প্রকাশিত হইল। ইহার প্রতিপ্রবন্ধে ভাবুক মাত্রেরই মর্ম্মের কথার—প্রাণের ব্যথার পরিস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধ-গুলিতে ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা বা দ্বেষের ছায়া মাত্রও নাই। ইহার প্রতিপ্রবন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অমৃতময়ী বা বিষাদময়ী চিন্তা-তরঙ্গিণীর লহরীলীলা দেখিতে পাইবেন। ধার্ম্মিক উহাতে নিজের স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন—প্রেমিক উহাতে মধুময় প্রেমতরঙ্গ দেখিতে পাইবেন—পাপী উহাতে অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ের নীল ছায়া দেখিতে পাইবেন।

আমার বিশ্বাস এই—পুস্তকখানি পাঠক মাত্রেরই চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইবে। শ্রান্তির বা ক্লান্তির পর,

সুখের বা দুঃখের সময়ে, গুরুজনের বা সহচরের সমীপে পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিবার সামগ্রী এই চিন্তা-লহরীতে প্রচুর পরিমাণে আছে। বাস্তবিক আমি "চিন্তা-লহরী" পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইলে ইহার প্রচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া, যাহা পাঠ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারি, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক অধিক নাই। সংসারের শোকে দুঃখে কাতর হইয়া চিন্তার প্রবল স্রোতে ভাসেন নাই—তরঙ্গাঘাতে মগ্নোন্মগ্ন হন নাই, এমন ভাগ্যবান্ কেহ আছেন কি? কত প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিয়াছেন? সুখ দুঃখের সহচরী ঐ সকল চিন্তা-লহরী দেখিতে পাইলে যেন প্রাণে শান্তি পাই। এই জন্য এই "চিন্তা-লহরী"ও পাঠকের প্রাণে শান্তি দিতে পারিবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানা সংবাদপত্র হইতে প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

কলিকাতা,
১৮৯৭। } সম্পাদক।

সূচীপত্র।

চিন্তা-লহরী।

"জয় জগদীশ হরে"।

একটীবার প্রাণ ভরিয়া বলরে মন—"জয় জগদীশ হরে।" এমন শান্তির নিকেতন, এমন শোক-দুঃখ-নিবারণ জগতে আর কিছুই নাই। শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া, পাপে তাপে ক্লিষ্ট হইয়া, আশঙ্কা উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া—আর কোথায়ও শান্তি পাইবে না; শান্তির প্রস্রবণ জগদীশচরণে

শরণ লও, তাঁহার জয় ঘোষণা কর, বল—"জয় জগদীশ হরে।"

অতীতের সুখ স্মৃতির অস্ফুট ছায়া আজ আমাকে আকুল করিতেছে,—শৈশবের ক্রীড়া-প্রসঙ্গ কত রঙ্গে হৃদয়ের অন্তরালে অন্তরালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একবার স্পষ্টভাবে দেখা দেয় ত কৃতার্থ হই—কিন্তু দেয় কই? বিলম্বিত-কদম্বহার-শোভিত সন্ন্যাসীর অপরিস্ফুট ছায়া ভিন্ন পূর্ণ মূর্ত্তিত আর চক্ষে পড়িল না,—তাঁহার সেই—

মন্দ পবন কুঞ্জভবন
কুসুম-গন্ধ মাধুরী
বিহরে আজ ব্রজ-সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমরী-চাতুরী॥

গানটী কি আর শুনিতে পাইব? যখন এ সকল কথা ভাবি,—তখনই আত্মহারা হই, শান্তিহারা হই, হৃদয়হারা হই। এই আত্মহারাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে কে? এই শান্তিহারার প্রাণে শান্তি প্রদান করিতে পারে কে? এই হৃদয়হারাকে হৃদয়

দান করিতে পারে কে? সেই অমৃতের প্রস্রবণ—
"জয় জগদীশ হরে।"

যখন ভাবি—'আমি' কে? জগতে যে 'আমি' আসিয়াছিলাম, সে 'আমি' এখন কই? যে 'আমি' পিতার অমৃতময় ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলাম সে 'আমি' এখন কই? যে 'আমি' সহচর সঙ্গে আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতাম, সে 'আমি' এখন কই? যে 'আমি' সুখের সংসারে সোণার পুতুল লইয়া অবিচ্ছেদে ক্রীড়া করিব বলিয়া কল্পনা করিতাম সে 'আমি' এখন কই? এখন পিতা নাই, সহচর নাই, পুতুল নাই—সকলের স্মৃতিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সে অভাবময় 'আমি'-গুলি এক নূতন "আমি"তে পরিণত হইয়াছি। প্রতি মুহূর্ত্তে "আমি" জন্মিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে 'আমি' মরিতেছি; বলত এই "মরা আমির" সমষ্টিকে কে বাঁচাইয়া রাখিতেছে? আমিত বলি,—সেই অমৃত নিষ্যন্দী "জয় জগদীশ হরে।"

যে রাজা সিংহাসনে বসিয়া নিজের সৌভাগ্যের তুলনায় ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন,—এরূপ

অনুপম সুখে বঞ্চিত হইলে মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব মনে করিয়াছেন,—তিনি আজ পথের ভিখারী হইয়াও অশ্বত্থমূলে সুস্থ শরীরে উপবিষ্ট, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উচ্চারিত হইতেছে —"জয় জগদীশ হরে।" এই "জয় জগদীশ হরে"ই কি তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে শান্তির ধারা বর্ষণ করিতেছে না? অভাব দগ্ধ হৃদয়ে সন্তোষামৃত সেচন করিতেছে না? হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেছে না?

বল দেখি, যাহাকে জীবনের জীবন প্রাণের প্রাণ ভাবিতে, যাহাকে না দেখিলে চারিদিক শ্মশান বলিয়া অনুভব করিতে, যাহার দর্শনে মরুভূমিকে নন্দন-কানন মনে করিতে—তাহার চিতার আগুন হৃদয়ে লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পার, সে শক্তি তোমার আছে কি না? তোমরা কি ভাব, জানি না, আমিত ভাবিতাম—সে শক্তি মানুষের নাই,—মানুষ কখনই ইষ্ট-বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হৃদয়ের ধন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে চিরকালের মত বিদায় দিয়া, তাহাদের শ্মশান-বহ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়া

মানুষ বাঁচিতে পারে না। শোকের ভার বড়ই দুর্বিষহ! সেই গুরুভার লঘু না হইলে, প্রাণের দুঃসহ যাতনা না কমিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু মানুষ ত বাঁচে। কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া মনুষ্য-হৃদয় এই দুর্বিষহ ভার বহনে সমর্থ হয় বলিতে পার কি? সুদীর্ঘ নিশ্বাস-বায়ুর সহিত প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইতে হইতে কোন্ আশায় দেহ মধ্যে অবস্থান করে বলত? কে তাহাদের হৃদয়ের শ্মশান-বহ্নি নির্ব্বাণ করে জান কি? আমি বলি—সেই সুধাবর্ষী "জয় জগদীশ হরে।" "জয় জগদীশ হরে" সুধাবর্ষণ করিয়া তাহাদের দুঃখ-দগ্ধ হৃদয় শীতল করে,—দুর্ব্বলহৃদয়ে বলের সঞ্চার করে, শ্মশানানলে দগ্ধ হৃদয়োদ্যানে ভগবৎ পদপল্লবের স্নিগ্ধ ছায়ায় তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করে, তাই তাহারা বাঁচিতে সমর্থ হয়। তাই বলিতে-ছিলাম, মনরে বল,—"জয় জগদীশ হরে।"

কি লইয়া জগতে আসিয়াছি জানি না, জানিতে চাই না। আসিয়া যাহা পাইয়াছিলাম,—যাহা জীব-

নের অবলম্বন, সহায়, সম্পদ বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, —যাহা জীবনের চিরসম্বল, চিরসহচর, চিরানুকূল মনে করিতেছিলাম,—তাহা এখন কোথায় গেল? ভাবিলে হৃদয় হতাশ-সাগরে ডুবিয়া যায়,—প্রাণ আকুল হয়; অভাবের আবরণে আবৃত হইয়া, বিচ্ছেদের আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন হইয়া যখন, চারিদিক অন্ধকার দেখি—তখন হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে অমৃতময় উচ্ছ্বাস উত্থিত হয়,—উত্থিত হয়, "জয় জগদীশ হরে।" অশান্ত হৃদয়ে শান্তির প্রস্রবণ বহিতে থাকে।

অনেক বার ভাবিয়াছি আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, কোথা যাইব? যখনই ভাবিয়াছি তখনই আত্মহারা হইয়াছি, বিভীষিকাময়ী চিন্তা-কবলিত হইয়াছি, সন্দেহময়, আতঙ্কময়, অজ্ঞান-ময়, অনন্ত অন্ধকার সম্মুখে বিস্তৃত দেখিয়াছি। কম্পিতহৃদয়ে, কাতরকণ্ঠে কতবার কত লোককে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—কিন্তু উত্তরত কখনই পাই নাই।

কে উত্তর দিবে? কোলাহলময় জগতে আমার ক্ষীণকণ্ঠের কাতরোক্তি কাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবে? চারিদিকে কোলাহল—কখনও আনন্দ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইতেছে; কখনও শোকের মর্ম্মভেদী কোলাহলে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে,—আমার কথা কে শুনিবে? আমার কথায় উত্তর দিয়া কে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে; কে আমার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিবে, কে আমার আতঙ্ক, আশঙ্কা, দূর করিয়া, স্বর্গীয় সুখের অধিকারী করিবে? কে আমার অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানময় জ্যোতির সুস্নিগ্ধ কিরণে শান্তিময় নিকুঞ্জের সৌম্যমূর্ত্তি দেখাইবে?

উত্তর না পাইয়া, প্রতিপদে হতাশ হইয়া আকুল-মনে, অধীরপ্রাণে,—যখনই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছি,—"জয় জগদীশ হরে"—তখনই হৃদয়ে সহস্র ধারায় অমৃত বৃষ্টি হইয়াছে; তাই বলি,—মনরে, একটী বার প্রাণের সহিত বল,—"জয় জগদীশ হরে।" তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়া কল্পতরু হারাইও

না, কুতর্কে মত্ত হইয়া শান্তির প্রস্রবণ ভুলিও না, অমৃত-সরোবর পরিত্যাগ করিয়া কূপগহ্বরে অমৃত অনুসন্ধান করিও না,—"জয় জগদীশ হরে" ভুলিও না। যদি হৃদয়ে শান্তি চাও তবে বল,—"জয় জগদীশ হরে," যদি প্রাণে অভয় চাও, তবে বল,—"জয় জগদীশ হরে", যদি আত্মাকে সর্ব্ব ক্লেশ-বিমুক্ত করিতে চাও, তবে বল,—

"জয় জগদীশ হরে।"

নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ত্তালতরঙ্গাকুল বিশাল বারিধিবক্ষে এক-খানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে আমি ভাসিয়া চলিয়াছি,—তরণীর চালক নাই, কর্ণধার নাই, আরোহী আমি একা,—দিশাহারা! যে দিকে তাকাই তরঙ্গ,—কেবলই তরঙ্গ,—অকূল তরঙ্গ-রাশির উপরে দিগন্ত-প্রসারিত কুজ্‌ঝটিকা রাক্ষসীর ন্যায় হৃদয়ের শোণিত শুষিয়া লইতেছে। নিরন্তর প্রতিকূল বাতে তরণী ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। কোথায় যাই! হৃদয়ে পর্য্যায়-ক্রমে নৈরাশ্য, আশঙ্কা, আতঙ্ক উদিত হইতেছে—এ বিপদে রক্ষা করে কে? মাগো, দুর্গতিহারিণি! এ বিপদে কাহাকে আশ্রয় করি?

মাগো! এই ভবসাগরে অনেক সহচরগণ সমবেত হইয়া প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন তরণী আরোহণে প্রস্থান করিয়াছিলাম,—কালের অনন্ত কুজ্‌ঝটিকায় তাহারা বিলীন হইয়াছে;—আমার নৌকার চালক কর্ণধার,—জ্ঞান, ভক্তি—এক বার দেখিতেও পাইলাম না;—ইন্দ্রিয়ানিল প্রতিপদে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে জানি না;—তাই ভীত হইয়াছি,—ভবনদীর তরঙ্গ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছি;—মাগো,—দুর্গা! শাস্ত্রে বলে, "দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-নৌরসঙ্গা;"—তুমি ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকা স্বরূপ, আমাকে রক্ষা কর মা!

মাগো, বড়ই ভীত হইয়াছি, নিরন্তর বিভীষিকা দেখিতেছি,—পাপ-রাক্ষস মুখ-ব্যাদান করিয়া প্রতি-মুহূর্ত্তেই যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, ঈর্ষা দ্বেষাদি নাগগণ আমাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, অবিশ্বাস অভক্তি প্রভৃতি শত্রুগণ আমাকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে, পরিজন-স্নেহ দস্যুরূপ ধারণ করিয়া আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে,

হৃদয়ে অনুতাপের দারুণ দাবানল জ্বলিতেছে! আমাকে কে রক্ষা করে মা! মাগো,

"দুর্গে, স্মৃতা হরসি দুঃখমশেষজন্তোঃ"

স্মরণ করিলেই না তুমি সকলের দুঃখ দূর কর; তুমি না, যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে উগ্রবিষ ভুজঙ্গগণ, যেখানে দস্যুদল, যেখানে দাবানল, যেখানে শত্রুগণ, যেখানে সমুদ্র ভয়, সেখানে উপস্থিত থাকিয়া জগৎকে রক্ষা করিয়া থাক, সেই জন্যই না দেবগণ বলিয়াছেন,—

"রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগাঃ
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্।"

তবে আমার প্রতি, অকৃতী সন্তানের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিবে না কেন মা? সেই জন্য তোমায় কাতর কণ্ঠে ডাকি, আমার ভীত, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর মা, তুমি সকলের হৃদয়ে শান্তিরূপে বিরাজ কর, আমি শান্তির প্রয়াসী, তোমার চরণে শরণ লইলাম,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

মাগো মায়াময়ি, তোমার মায়ার খেলা আমি কিরূপে বুঝিব;—যে দিকে তাকাই অন্ধকার দেখি, ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, অথচ আমি মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন; ভয়ের সময়েও নিদ্রা! এ তোমারই নিদ্রা-মূর্ত্তির প্রভাব, এরূপ সম্বর মা, আমি কাতরকণ্ঠে বলি,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা"

তোমার সে মূর্ত্তি আমি দেখিতে চাই না,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

তোমার চেতনামূর্ত্তি সর্ব্বব্যাপিনী, আমাতে তাহা অপ্রকাশ কেন, অন্তর্লীন কেন, চেতনার মধুময়ী, শান্তিময়ী, ভক্তিময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই না কেন? চেতনার উজ্জ্বল মূর্ত্তি একবার দেখিলে আমার চক্ষের সম্মুখের কুজ্ঝটিকার গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত হয়।

মাগো, আমি ভ্রান্ত; ভ্রান্তকে আর ভ্রান্তিজালে আবৃত করিও না; আমি দিশাহারা, দিঙ্‌নির্ণয়ে অসমর্থ, আমার নিকট হইতে তোমার ঐ মূর্ত্তি প্রতি-সংহার কর। তুমি ঐরূপে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ বলিয়া, আমি তোমার কোন রূপই দেখিতে পাই না, উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও পরিবার-বর্গের "ক্ষুধার" কথা ভাবি, "তৃষ্ণার" কথা ভাবি, "বৃত্তির" কথা ভাবি; ক্ষুধা তৃষ্ণা বৃত্তি যে তোমারই মূর্ত্তি, তাহা ভাবি না, তুমি আমাকে এমনি ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন করিয়াছ। তোমার ভ্রান্তিমূর্ত্তি দেখিলেও যে আমি কৃতার্থ হইতে পারিতাম। তাই বলি মাগো, একবার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দাও, তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করি, ভবসাগরের তরঙ্গাবলিকে লীলা-সরোবরের লহরী-লীলা মনে করিয়া হৃদয়ে তৃপ্তি অনুভব করি।

মাগো, একটীবার আমার হৃদয়ে "শ্রদ্ধা"-রূপে অধিষ্ঠান কর। তুমি ত শ্রদ্ধারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ কর, আমি তোমার সে রূপ দেখিতে পাই না কেন?

এক বার দীনের প্রতি প্রসন্ন হও,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা"

সেইরূপটী দেখাও মা!

তুমি ত শরণাগতের দুখঃ দূর করিয়া থাক, তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমার মত পাপতাপ-ক্লিষ্ট বিশ্বকে রক্ষা কর,—

"দেবিপ্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥"

মাগো সন্তানের প্রতি কৃপা কটাক্ষ কর, আমি কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছি, মাতৃরূপে দেখা দাও। বিপৎকালে মা বিনা আর কাহাকে ডাকিব? দুঃখে অনুতপ্ত হইয়া আর কাহাকে ডাকিব? কাহার চরণে নমস্কার করিয়া প্রাণের জ্বালা ভুলিব? তাই বলি,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

রি হে,—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।" সংসার মরুতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,—নিরন্তর মরীচিকার অনুসরণ করিয়া করিয়া,—আমি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছি; আশ্রয় নাই যে বিশ্রাম করি; ছায়া নাই যে আশ্রয় করি; তাই হতাশপ্রাণে, ব্যাকুলমনে, তোমার উদার পদপল্লবের ছায়া প্রার্থনা করিতেছি—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

আমার সাধ মিটিয়াছে,—সংসারের সাধ আমার আর নাই। আমি নিতান্তই ভীত হইয়াছি, উদ্বিগ্ন হইয়াছি, আকুল হইয়াছি,—চারিদিকে বিষধর অজা-

গর, চারি দিকে নৃশংস নিশাচর, চারিদিকে দাবানলের অনন্ত স্ফুলিঙ্গ, চারিদিকে দুঃখসাগরের অসংখ্য তরঙ্গ! একবার ইচ্ছা হয়, পলায়ন করি, কিন্তু কোথায় পলাইব? এই উদারতাহীন, সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার কে করিবে? বিষধরকে মুগ্ধ করিতে পারে, নিশাচরকে দিশাহারা করিতে পারে, দাবানলের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারে, সাগর-তরঙ্গে রক্ষা করিতে পারে, আমার এমন ঔষধ চাই, এমন অবলম্বন চাই;—কিন্তু কোথায় পাই?—শুনিয়াছি তোমার পদপল্লব কালিয়বিষধরের করাল প্রতাপ নষ্ট করিয়াছিল, অনেক নিশাচরকে মুগ্ধ করিয়াছিল, প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য কালানলকে শীতল করিয়াছিল, স্পর্শমাত্রে প্রস্তর সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসাইয়াছিল, তাই আজ কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি,—"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

হরি হে আমি পথ হারা পথিকের ন্যায়, কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়, ঝটিকাবিক্ষিপ্ত শুষ্ক পর্ণের ন্যায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি;

আমার দুঃখ কে দূর করিবে? আমাকে কে পথ দেখাইবে, কে আমার লক্ষ্যহীন জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবে? অনন্ত সমুদ্রে অসংখ্য বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হইতেছে, লয় হইতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করে, কে তাহার লক্ষ্য স্থির করে? বুদ্‌বুদের ঐ টুকুই সুখ, তাহারা মরিয়াও সুখ পায়। কিন্তু আমি যে সে সুখেও বঞ্চিত! আমার মত পথহারা, দিশাহারা, লক্ষ্য হারা, প্রাণীও যে আমার নেতা হইতে চায়! অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে চায়! তাই আমি হতাশ প্রাণে ডাকিতেছি "দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

হরি হে, তুমি ত্রেতাযুগে রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়া দেব-মানবের ভয় দূর করিয়াছিলে, কলিতে কর না কেন? এই যে চারি দিকে রাক্ষসগণ নানা-রূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? ঐ দেখ দশানন, কতরূপে লোকের প্রাণ সংহার করিতেছে, ঐ দেখ মহীরাবণ কত মায়া বিস্তার করিতেছে, ঐ দেখ সূর্পণখা, বিলাসিনী-বেশ ধারণ করিয়া কত লোককে বিপথগামী করিতেছে!

চারিদিকে রাক্ষস! চারিদিকে বিভীষিকা! আমি কোন্ দিকে যাই? তাই তোমায় ডাকিতেছি, একবার রামরূপে রাবণের দশ মুণ্ড ছেদন কর, প্রতারণা ছলনা হইতে লোককে উদ্ধার কর; মহীরাবণের মায়া প্রপঞ্চ ভেদ কর, লোকের চক্ষের প্রহেলিকা দূর কর; আর লক্ষ্মণরূপে সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া আমার চারিদিক বিভীষিকা শূন্য কর।

মায়াবীদিগের মায়ায় আমি অধীর হইয়াছি। আমি ভব-সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া আতঙ্কে মরিতেছি, ঐ দেখ কত ভণ্ড, কত প্রতারক, কত মায়াবী, আমাকে আশ্বাস দান করিতে আসিতেছে! কেহ শাস্ত্র-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে অভিলাষী, কেহ বা নরনারীর সাম্য স্থাপন করিয়া, প্রকৃতি পুরুষের অবিচ্ছিন্ন সংসর্গ দেখাইয়া আমাকে ভব-সাগর পার করিতে ব্যস্ত! আমার দুঃখে যেন তাহা-দিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, প্রাণ আকুল হইয়াছে আমাকে যেন উদ্ধার না করিলেই নয়! আমি এরূপ বিষম দয়ালুর বিষম করুণায় অস্থির হইয়াছি;

মধুসূদন এ বিপদে আমায় রক্ষা কর, "দেহি পদপল্লব-মুদারম্"।

হরি হে, আমি নিতান্ত নিরুপায়, নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। চারিদিকে বিভীষিকা, চারিদিকে প্রতারণা, চারিদিকে প্রবঞ্চনা, চারিদিকে মায়ার বিষম খেলা! এ মায়াজাল ভেদ করিতে পারি আমার সে ক্ষমতা কৈ! কত ছলে, কত কৌশলে, যমের দালালগণ, নরকের পাণ্ডাগণ, রসাতলের নেতৃগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহা আমি বুঝিতেও পারি না!

এমন বিষম বিপদে পড়িলে যাহা হয়, আমার আজ তাহাই ঘটিয়াছে! আমি আজ জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতেছি। ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সমস্ত আমার চক্ষে অন্ধকার! কালের তমসাবৃত কুক্ষি-বিলীন শৈশবসহচরগণের ছায়াময়, কল্পনাময়, বিষাদময় ছবি যেন আমার চক্ষের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর বলিতেছে, এরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়াই আমাদের এদশা ঘটিয়াছে,—সাবধান!

কল্পনার ছায়াবাজি ফুরাইল, শৈশব-সহচরের ছায়াময় ছবি অন্তর্হিত হইল; অতীতের দিকে লক্ষ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল; গাঢ় অন্ধকার শোক-দুঃখে গাঢ়তর হইল,—হৃদয়ে যেন একটা অন্ধকারের মহা-সাগর সৃষ্টি হইল, শৈশবের সহচর-বিচ্ছেদ তাহাতে তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতে লাগিল! বন্ধুগণ সাগরের তরঙ্গ ছলে মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন বলিতে লাগিল—সাবধান! সাবধান! ভবিষ্যতে সাবধান!

ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার। এই যে নরচর্ম্মাবৃত রাক্ষস রাক্ষসী; পিশাচ পিশাচীগণ আমার চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা আমায় কোথায় লইয়া যাইবে; ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন মহামরুতে, মহাসাগরে বা মহাশূন্যে, কোথায় লইয়া যাইবে, কেমন করিয়া জানিব? যাহা ভাবিলে কল্পনাও ভয় পায়, আত্মা শুকাইয়া যায়, তাহাতে কিরূপে সাবধান হইব? আমার ভবিষ্যতের কথা যতই ভাবিতে থাকি, ততই হতাশ-সাগরে ডুবিতে থাকি!

হরি হে, তমসাচ্ছন্ন একার্ণবীভূত জগতে অসংখ্য

ব্রহ্মাণ্ড কুক্ষিগত করিয়া একটী বটপল্লবে তুমি শয়ান ছিলে, বটপল্লব তোমার ভারবহনে সমর্থ হইয়াছিল ;—আমি এই হতাশসাগরে নিরন্তর মগ্নো-ন্মগ্ন হইতেছি, যাহা অবলম্বন করিতেছি তাই ডুবিতেছে, তরণী আমার ভার সহিতে পারেনা, বাষ্পপোত আমার ভারবহনে অক্ষম, অর্ণবযান আমাকে ধারণ করিতে অসমর্থ, আমার গুরুত্ব এত অধিক, আমার ভার এত দুর্ব্বহ, এতদিনে বুঝিলাম—

"পাষাণের ভার নয় ত গুরু,
পাপের ভারই গুরু অতি।"

আমার পাপের গুরুভার কে বহিবে, এমন উদার কে আছে যে আমাকে হতাশ সাগর হইতে রক্ষা করিবে, তাই কাতর কণ্ঠে তোমায় বলি "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" তুমিত দয়াময়, তুমিত দীনবন্ধু, তুমিত পাপনিসূদন, তোমার পদস্পর্শে আমার পাপভার লঘু হইবে, তখন পল্লবও আমার ভারবহনে সমর্থ হইবে, তাই, তোমার শরণ লইলাম বঞ্চিত করিওনা, তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক রাখিওনা,—

"দেহি পদ পল্লব মুদারম্।"

কে দিল তরঙ্গে।

প্রাতঃকাল। আকাশ মেঘাবৃত। প্রখর বায়ুর সংসর্গে নদীবক্ষঃ তরঙ্গাকুল। যে দিকে তাকাই অন্ধকার,—কেবলই অন্ধকার!

এক খানি তরণী তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে;—কাণ্ডারী নাই, চালক নাই, আরোহী আমি একা!

দূরে—অতিদূরে,—কে গাহিল,—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"—

সে সঙ্গীতধ্বনি আমার মরমে পশিল, প্রাণ আকুল

করিল; হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাব-তরঙ্গের আবির্ভাব হইল,—মনে হইল যেন নদীর তরঙ্গের উপর সঙ্গীত-তরঙ্গ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এবং আমার তরঙ্গগত প্রাণে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে।

"কে দিল তরঙ্গে"—কথাটা আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল। একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলাম, নিবিড় মেঘাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেববালা গাহিতেছে কিনা দেখিলাম। একবার তরঙ্গাকুল নদীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিলাম, জলদেবীগণ নদী ভেদ করিয়া সঙ্গীত-সুধা উদ্‌গিরণ করিতেছে কি না দেখিলাম। কিছুই দেখিলাম না, খালি প্রাণের ভিতর শুনিতে লাগিলাম,—"কে দিল তরঙ্গে।"

আকুল হইয়া, দিশাহারা হইয়া, সঙ্গীতের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া, যখন একতানমনঃপ্রাণে শুনিতেছিলাম "কে দিল তরঙ্গে", তখন আবার শুনিলাম—

'ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।"

মধুরতানে বিহ্বল হইলাম, বিমোহিত হইলাম, আত্মহারা হইলাম,—চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কৈ, সবটুকু মিলিল কৈ? সকাল বেলা তরী ভাসিয়াছে, জল খেলা ভাবিয়াছি সত্য; কিন্তু মধুর বায়ু বহিল কৈ? রঙ্গে ভাসিয়া যাইতে পারিলাম কৈ? এ যে তরঙ্গে প্রাণ আকুল হইতেছে—

"গভীর গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে?"

কে গো! তুমি কে গাও বল না গো! আমার প্রাণের কথা কাণের ভিতর সুধার স্রোতে কে ঢালিতেছ বল না গো? মেঘের ঘন-ঘোর-ভৈরব-গর্জ্জনে আমার প্রাণ হু হু করিতেছে, প্রচণ্ড পবনের ভীম নির্ঘোষে প্রাণ আকুল হইতেছে, অকূলে পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আতঙ্কে মৃত্যুর ছায়া দেখিতেছি,—আমার মনের এই কথা গুলি কে আমার কাণে ঢালিলে বল না গো?

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিলাম তরী,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

মনে করি কূলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু, বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

গায়ক! তুমি দেব হও, গন্ধর্ব্ব হও, আর মানব হও, তুমি কোথা হইতে আমার অবস্থা দেখিলে বল না? আমি যাহাকে কাণ্ডারী করিয়াছিলাম সে যে তরণীতে 'পদ'-স্পর্শ করিল না, তুমি কেমন করিয়া দেখিলে? আমি কূলে ফিরিবার জন্য, কূলের ধারে ধারে, ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে তরী চালাইবার জন্য কল্পনা করিতেছিলাম, কূলে বিষধর বেষ্টিত কণ্টক-তরুর কথা মনে করিয়া কল্পনা ত্যাগ করিতেছিলাম, তাহা কেমন করিয়া জানিলে বল না?

তুমি যে হও, সে হও, আত্মগোপন করিও না। অকূল জল-রাশির তরঙ্গাবলী মার্কণ্ডেয়কে অধীর করিয়াছিল, আমিত ক্ষুদ্র জীব! আমি অধীর হইব বিচিত্র কি? তাই অধীর হইয়া ভাবি—"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে?"

উত্তর পাইলাম না,—প্রতিধ্বনি হইল "কে দিল তরঙ্গে।" "সাধের তরণী"—"সকাল বেলা" "বায়ু"

"কাণ্ডারী" "কণ্টক-তরু" "ভুজঙ্গ" প্রভৃতি প্রত্যেকটী কথা যেন, হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া হতাশপ্রাণে ভাবিতে লাগিলাম,—"কে দিল তরঙ্গে ?"

ভাবিলাম পুত্র-কলত্র-নাশ-বিচ্ছেদ-ঝটিকাকুল ভব নদীর শোক-দুঃখাদি-তরঙ্গে অজ্ঞান-মেঘমণ্ডলাচ্ছাদিত শৈশবে আমার সাধের জীবন-তরণী কে ভাসাইল ? মধুরবায়ুভরে নদীর তরঙ্গ-লহরী ভেদ করিয়া, মনের আনন্দে ভাসিয়া যাইতে পারিলাম না কেন ? কেন আমার অদৃষ্টাকাশে গভীর ঘন-গর্জ্জন হইল, কেন খর সমীরণ প্রবাহিত হইল, কেন প্রাণের ভিতর আতঙ্ক প্রবেশ করিল ?

"কূল ত্যজি এলাম কেন ?" কূল ত্যাগ করিয়া আসিয়া অকূলে ভাসিতেছি, কূল কোথায় জানি না। —কোথা হইতে আমি আসিয়াছি, কোথা হইতে জীবন তরী ছাড়িয়াছি, কূল ত্যাগ কেন করিলাম, কিছুই জানি না, সমস্ত আমার চক্ষে অন্ধকার !

আমার জীবন-তরী কাণ্ডারী-শূন্য হইয়া কক্ষ-

ভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় ভব-নদীতে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে ; যে ভব-নদীর কাণ্ডারী, যাহার ভরসায় ঝটিকা-সঙ্কুল তরঙ্গাকুল নদীতেও বুক বাঁধিয়াছিলাম, যাহার পাদস্পর্শ কামনায় তরী সাজাইতেছিলাম—'সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।'

তরণী অকূলে ভাসিতেছে! কূল কোথায় পাই? কাণ্ডারী নাই, কূলে লইয়া যায় কে! ইচ্ছাত হয় যে, তরী কূলে লইয়া যাই, ধীরে ধীরে, তরঙ্গ-হীন প্রবাহে, সুবাতাসে তরী চালাইয়া যাই, কিন্তু পারি কৈ?

আমি অজ্ঞানান্ধ, আমি যাহা কূল ভাবি, তাহা কূল নহে—কণ্টকের রাজ্য, বিষধরের রাজ্য! ভবনদীর তরঙ্গে ভীত হইয়া এ কূল আশ্রয় করিলে নিজেই মরিব! কূলে নরনারীগণ আমাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সমবেত হইয়াছে, কিন্তু তার একটীও প্রাণী নয়, সব কয়টী কণ্টক তরু, আবার দ্বেষ ঈর্ষ্যা দম্ভ অসূয়াদি তীব্র বিষধরগণ কণ্টক-তরু বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেখানেও কি জীব বাঁচে? তাই বলিতেছিলাম, কূল কোথায় ছাড়িয়া

আসিয়াছি জানি না, তাই কাঁদিতেছিলাম "কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে ?"

বল গো, আমার সাধের তরণী, সাধের মানব-জীবন, এই ভব-নদীর ঘোর তরঙ্গে কে ভাসাইল ? যে ভবনদীর কাণ্ডারী শ্রীহরিকে কাণ্ডারী করিয়া তরী ভাসাইয়াছিলাম, আমার সে কাণ্ডারী, সে চালক, সে কর্ণধার কোথায় গেল ? যাহার চরণ-স্পর্শে তরণী পবিত্র হইবে ভাবিয়াছিলাম, সে হরি কোথায় গেল ? কেনই বা "সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে ?"

আমার সাধের তরণী আজ পাপের দারুণ ভারে নিমগ্ন প্রায় ;—ঝটিকান্দোলিত তরঙ্গায়িত প্রবাহে নিমগ্ন না হইয়া থাকিতে পারে না জানি, তাহাতে দুঃখ নাই ; আমার সাধের তরণী কে তরঙ্গে দিল জানিলাম না, ইহাই আমার দুঃখ ! তোমরা জান যদি বল গো, এমন করিয়া "কে দিল তরঙ্গে ?"

কথায় কি আছে ?

কতকগুলি কথা শুনিলে আমার প্রাণ আকুল হয়। ঐ সকল কথার ভিতর কত মধু, কত অমৃত, কত সুখ, কত দুঃখ, কত স্মৃতি, কত স্বপ্ন, আরও কত কি আছে আমাকে কেহ বলিতে পার কি ?

আমি ঐ কথা গুলির অভ্যন্তরে কত হারাণ নিধির মোহময়ী ছায়া দেখিতে পাই, কত অজ্ঞাত বন্ধুর মধুময় স্বর শুনিতে পাই, কত অশ্রুত সঙ্গীতের ভাবময় মাধুর্য্য অনুভব করি, কত অদৃষ্ট সৌন্দর্য্যের প্রীতিময় প্রভা প্রত্যক্ষ করি,—তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করি, কথায় কি আছে বল না ?

"যমুনা-পুলিনে" "নিকুঞ্জ-কাননে" কে অমৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, "বনমালায়" "চিকণ কালায়" কে আমার প্রাণ লুকাইয়া রাখিয়াছে,—বলিতে পার কি?

হায় রে,—মনের ভাব কি বলিয়া প্রকাশ করিতে হয় জানি না! বুঝাইতে পারিলে, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেখাইতে পারিলে, বুঝাইতাম, দেখাইতাম, "কালিন্দী-কূল" "যমুনা-জল" কেমন করিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কেমন করিয়া আমার প্রাণের ছায়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

"কদম্ব-মূলে" "তমাল-তলে" আমি বাঁশরীর শব্দ শুনিতে পাই। কোথায় কদম্ব-মূল, কোথায় তমাল-তল, কোথায় শ্যামসুন্দর, কোথায় সেই বাঁশরীর স্বর! যেখানে দাঁড়াইয়া ত্রিভঙ্গমুরারি বাঁশরী বাজাইতেন সে কদম্ব-মূল আর নাই। এখন আর ত্রিভঙ্গমুরারি, বাঁকাশ্যাম বাঁশরী বাজান না। তথাপি, কোথা হইতে "সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কাণে"—আমি বাঁশরীর শব্দ শুনিতে পাই! "কদম্ব-মূল" "তমাল-তল" আজিও বাঁশরীর স্বর ভাবুকের

কাণে ঢালিতেছে—তাই জিজ্ঞাসা করি, কথা কোন্ শক্তির বলে, এমন করিতে সমর্থ হয় বল না,—কথায় কি আছে বল না!

কেহ "কদম্ব-মূল", বা "তমাল-তল" বলিলে আমার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। সে তন্ত্রীর স্বরে বাঁশরীর স্বরলহরী অস্ফুট লীলা বিস্তার করে। তাই তোমায় সুধাই "যমুনা-কূলে" "তমাল-তলে" কি আছে বল না!

যে কথায় লোককে পাগল করে, যে কথায় লোককে মুগ্ধ করে, যে কথায় লোককে প্রকৃতিস্থ করে, যে কথায় লোককে আত্মহারা করে,—সে কথায় কি আছে, কেমন করিয়া জানিব? কথায় মানুষ বাঁচে, কথায় মানুষ মরে—কথায় অমৃত আছে কি বিষ আছে, কেমন করিয়া জানিব? তাই কাতর কণ্ঠে তোমায় জিজ্ঞাসা করি—বন-মালায় চিকণ কালায়, যমুনাজলে তমালতলে, কালিন্দী-কূলে কদম্ব-মূলে, নিকুঞ্জ-কাননে যমুনা-পুলিনে,—কি আছে বল না?

"বন-মালা" বলিলে, "যমুনা-কূলে" শুনিলে 'মুরলীর' কথা হইলে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি, শূন্য দেখি; মোহময়,—ছায়াময়—কুজ্‌ঝটিকাময় অভাব যেন আমার হৃদয়টা যুড়িয়া বসিয়া থাকে;— এ অভাব কিসে পূর্ণ হইবে জানি না, কাহার অভাব তাহাও জানি না! মনে হয়, যদি ভাবিতে পারি—

"চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর
পীতবসন বনমালী,—"

তবে যেন হৃদয়ের অভাবটা পূর্ণ হয়; মনে হয়, যদি তানলয় সংযোগে শুনিতে পাই—

"জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ",—

তবে যেন হৃদয়ের অভাব কতকটা লঘু হয়; মনে হয়, যদি দেখিতে পাই,—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ",—

তবে যেন হৃদয়ের মোহ, অভাব, অন্ধকার সমস্ত দূর হয়!—বলিতেছিলাম, যে কথায় সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, প্রণয় বিদ্বেষ দূর করিয়া হৃদয়ে এরূপ অভাবের

রাজ্য বিস্তার করে, সে কথায় কি আছে বল না? একদিন শুনিলাম,—

"মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী
শ্যামবিলাসিনী রে—"
"বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন—"

স্বর্গ মর্ত্ত্য, আকাশ পাতাল, গ্রহ নক্ষত্র, সমস্ত যেন শিহরিয়া উঠিল; সকলই যেন একতান-স্তিমিতনেত্রে সঙ্গীতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল; ক্রমে সঙ্গীতটী যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্যময়, গ্রহ-নক্ষত্রময়, আকাশ-পাতালময় হইল! কেন এমন হইল? "মথুরাবাসিনীর" এমন কি শক্তি আছে যে একবার শুনিলেই ত্রিভুবন পুলকিত হয়? "শ্যামবিলাসিনী" কোন্ শক্তির বলে ত্রিলোক আকর্ষণ করিতে পারে? "বৃন্দাবন-ধন" কোন্ মায়ায় জগৎ মুগ্ধ করিতে পারে?—আমিত খুঁজিয়া পাই না,—তাই বলি, কথায় কি আছে, বল না।

কথায় কি আছে,—কোন্ মোহন মন্ত্র কোন্ কথায় বিরাজ করিতেছে, কোন্ কথায় মহামায়া

অধিষ্ঠান করিতেছেন, জান যদি বল না! হৃদয়ে জন্ম জন্মান্তরীণ অনন্ত ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে, অজ্ঞান অন্ধকার তাহা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; যে কথা, চপলার ন্যায় ক্ষণপ্রভা বিস্তার করিয়া, আবার হৃদয়টাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, মনে হয় কি যেন দেখিতে দেখিতে দেখা হইল না, কি যেন পাইতে পাইতে হারাইয়া গেল, কি যেন মন প্রাণ আকুল করিয়া চঞ্চল চপলার ন্যায় চলিয়া গেল! যে কথা, পূর্ণ হৃদয়ে অভাবের প্রভাব বিস্তার করে, শান্ত হৃদয়ে উৎকণ্ঠার উৎপাদন করে, অচঞ্চল চিত্তে অস্থিরতার আবির্ভাব করে, বলত, তাহাতে কি আছে?

আমি এই নিবাত নিষ্কম্প দীপালোকে বসিয়া কাব্যপাঠে মলয়ের সমীরণ উপভোগ করিতেছি, সুধাকরের সুধামাধুরী পান করিতেছি যমুনার তরঙ্গ-ভঙ্গী অবলোকন করিতেছি, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-কাননে ভ্রমণ করিতেছি; বলত, কে আমার রুদ্ধ কক্ষে সমীরণ আনিতেছে, চন্দ্রিকার বিকাশ করিতেছে, তরঙ্গলীলা প্রকাশ করিতেছে, কুসুম-কানন উপস্থিত

করিতেছে? কেবলই "কথা" নয় কি? যে কথা এত পারে, সে না পারে কি? যাহাতে এত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে যে কি আছে, হীনবুদ্ধি আমি কেমন করিয়া বলিব?

কথায় কি আছে জানি না, কি নাই জানি না। কথা জগৎটাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কথায় জগৎ হাসিতেছে, জগৎ কাঁদিতেছে, কথায় অভাবের সৃষ্টি হইতেছে, অভাবের পূরণ হইতেছে;—যাহা কখন দেখি নাই, কথা তাহাকে নয়নের সম্মুখে আনয়ন করে, যাহা কখনও শুনি নাই, তাহাও শ্রবণের গোচর করে; এমন অনন্ত শক্তি কথার ভিতর কি আছে, কেমন করিয়া জানিব?

কথা অনন্তরূপ। শিশুকালে যে কথা যেরূপে দর্শন দিত, এখন আর সেরূপে দর্শন দেয় না। তখন "বাসুদেব" শুনিলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইত, জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী, সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট, কনক-কুণ্ডলবান্, হিরণ্ময়-বপুঃ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, —রূপটী কেমন বল দেখি? এ রূপে জগৎ ভুলে

কি না বল দেখি? এ রূপ দেখিলে সমস্ত অভাব দূর হয় কি না, সমস্ত অপূর্ণ পূর্ণ হয় কি না, প্রাণে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় কি না বল দেখি? বয়সের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল,—"বাসুদেব" নূতন নূতন রূপে দর্শন দিতে লাগিলেন, কখনও নির্জীব শিলা, কখনও চৈতন্যাধিষ্ঠিত শিলা, কখনও সন্দেহাচ্ছন্ন, কুতর্কাচ্ছন্ন, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন, মায়াময়, অপরিস্ফুট অপরিচ্ছেদ্য রূপে দর্শন দিতে লাগিলেন! যে কথার এরূপ বিশ্বব্যাপী অনন্তরূপ, তাহাতে কি আছে,—আমি কেমন করিয়া বলিব?

যাঁহারা যোগবলে বলীয়ান্,—যাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহারাই কথার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেন, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

কথা ধ্বনি হউক, আর বর্ণ হউক, তাহা অক্ষয়, অবিনশ্বর, অনন্তকালস্থায়ী। কথার আদি নাই, অন্ত নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই;

তাহার শক্তির তুলনা নাই, গুণের ইয়ত্তা নাই। এই কথায় কি আছে,—আমার মত অজ্ঞান বলিতে পারে কি!

মহর্ষিরা বলেন,—কথা ব্রহ্ম! কথায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, কথায় গ্রহ নক্ষত্র ভূমণ্ডল, কথায় খেচর ভূচর জলচর, কথায় যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর—জগৎ কথাময়, জগন্ময় কথাময়! আমি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন —তাই তোমাদিগকে সুধাই, একটী বার বল গো কথায় কি আছে?

"কা চ বার্ত্তা ?"

দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কা চ বার্ত্তা ?" আজ সে যুধিষ্ঠির নাই, সে বকরূপী ধর্ম্মও নাই, কিন্তু তথাপি, আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বসিয়া ধর্ম্ম যেন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কা চ বার্ত্তা ?"

"কা চ বার্ত্তা ?" শুনিয়া প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল, মায়াসরোবরের সেই ভীষণ দৃশ্য কল্পনা-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম,—ভীমসেনের বিশাল দেহ সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে ভাসিতেছে, প্রতি তরঙ্গাঘাতে দ্রৌপদীকলেবর বিকশিত ইন্দীবরের

ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে,—এবং কুসুমলাবণ্য হারী নকুল সহদেব, ও পারিজাতপাদপ-সদৃশ সব্যসাচী বায়ুভরে ইতস্তত: চালিত হইতেছে, ভাবিলাম, এই ত "বার্ত্তা"; ইহার উপর আবার জিজ্ঞাসা কেন "কা চ বার্ত্তা?" যাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রণয়িনীর নির্জীব দেহ বিদ্যমান, প্রাণপ্রতিম ভ্রাতৃবর্গের মহা-শ্মশান, তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন,—"কা চ বার্ত্তা?" যাঁহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, এ জিজ্ঞাসা কি তাঁহার পক্ষে দারুণ রহস্য নয়? ধর্ম্ম —পিতা, যুধিষ্ঠির—পুত্র; পিতাপুত্রের এরূপ দারুণ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ কে করিবে? তোমরা কেহ বলিয়া দিবে কি, যুধিষ্ঠিরের প্রতি কেন প্রশ্ন হইল "কা চ বার্ত্তা?"

ভাবিলে দেখিতে পাইবে, এ প্রশ্নে অনেক গভীর তত্ত্ব, অনেক প্রচ্ছন্ন উপদেশ নিহিত আছে—ইহাতে বলা হইয়াছে, জগতের সুখদুঃখ হর্ষবিষাদের পর্য্যালোচনা করিয়া আমাকে বল তাহার সারবত্তা কি? কিছুতেই অধীর হইও না,

কিছুতেই আত্মহারা হইও না, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, কেহ কাহারও নহে,—কাহারও অবিচারে কুণ্ঠিত হইও না, কাহারও ব্যভিচারে উন্মত্ত হইও না, তাহাদের সদ্ভাবে হাতে স্বর্গ পাইও না, তাহাদের অসদ্ভাবে পাতালোদরে প্রবেশ করিও না। সকলেরই নিজের কর্ত্তব্য আছে, ভ্রাতৃ-পত্নী-শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করা কর্ত্তব্য নহে,—ধর্ম্মের কথার উত্তর করা, সকলেরই কর্ত্তব্য,—ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল,—বল যুধিষ্ঠির,—"কা চ বার্ত্তা?" ইহা রহস্য নয়, বিদ্রূপ নয়, প্রাণের কথা, মর্ম্মের কথা,—বল সত্যবাদিন্,—"কা চ বার্ত্তা?"

যুধিষ্ঠির, তুমি সংসারে অনেক দিন আসিয়াছ, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, তোমার চক্ষের সম্মুখে কত মাস, কত ঋতু আসিয়াছে, আবার চলিয়া গিয়াছে—কত দিন রাত্রির আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে, কতবার চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত

হইয়াছে, এই সকলে কি দেখিয়াছ, কি শিখিয়াছ কোন্ তত্ত্ব অবগত হইয়াছ, জানিবার জন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কা চ বার্ত্তা ?”

আমি অনেক সময়ে অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে বঞ্চিত হইয়াছি, প্রকৃতির লীলাময়ী ক্ষেত্রে বসিয়া মানব দানব, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, কুসুম কিশলয় প্রভৃতিকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাই নাই,—তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম, বাছা, বলত,—“কা চ বার্ত্তা ?”

সুখের সময়ে লোকের সদসৎ জ্ঞান থাকে না, তাহারা কোন বিষয়ে পরিণাম চিন্তা করে না, উপদেশ দিলে কর্ণগোচর করে না, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর করে না,—তাই, হে ভ্রাতৃ-পত্নী-বিয়োগ-কাতর যুধিষ্ঠির, তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলত,—“কা চ বার্ত্তা ?”

তোমাকে একটী দিনের কথা বলিব, এক দিন এ প্রশ্নটীর উত্তর পাইবার জন্য

উদ্যানে বসিয়া সমস্ত দিনটা সমস্ত রাত্রিটা কাটাইলাম; কত বালক বালিকা, কত যুবক যুবতী, কত দানব দানবী, কত পশু পক্ষী, কত কীট পতঙ্গ, উদ্যানবিহারে আসিল, ক্রীড়ান্তে চলিয়া গেল; সকলের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলের হৃদয়ের অন্তরালে অন্তরালে ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কা চ বার্ত্তা?" কেহ আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না;—যে, যে কাজে আসিয়াছিল, সেই কাজেই ব্যস্ত হইল!

বালক বালিকাগণ উদ্যান-প্রান্তরে ক্রীড়ায় ব্যস্ত হইল,—জাহ্নবীর তরঙ্গলেখার ন্যায় প্রান্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিতে লাগিল,—তাহাদের হৃদয় পবিত্র, দেহ পবিত্র; তাহারা নববিকশিত কুবলয়ের ন্যায় মধুর সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল, তাহাদের সরল প্রাণে আমার দারুণ প্রশ্ন প্রবেশ করিবে কেন, তাহারা সংসারের কি সংবাদ রাখে যে আমার প্রশ্নের উত্তর করিবে? তাহারা আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর করিল না,

কেবল আকাশে কথাটীর প্রতিধ্বনি হইল "কা চ বার্ত্তা ;"

সরোবর তীরে যুবক যুবতী বসিয়া পবিত্র প্রেমালাপ করিতেছে, সমীপবর্ত্তী বৃক্ষে কোকিলের কুহু কুহু, কুসুমে ভ্রমরের গুন্ গুন্! হঠাৎ যুবতীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, নীল নলিনাভনয়নে কোকনদরাগ প্রকাশ পাইল! কেন এমন হইল,—হঠাৎ যুবকের চক্ষেও জল আসিল,—তখন সে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।"

যুবতীর গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীরতর হইল, কেশ-জলদজাল চন্দ্রাননীর আননচন্দ্র আবৃত করিল; যুবকহৃদয় অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল, তখন যুবক বলিল,—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।"

আর, হরতি! যুবতীর তখন মুখ আরও

দরতিমিরাচ্ছন্ন হইল; যুবক অনন্যগতি হইয়া, গল-লগ্নীকৃত বাসে বলিল,—

"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

এবার যুবক যুবতীর আননচন্দ্রে চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠিল, জলদহৃদয়ে বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ পাইল,—আকাশ পাতাল এক হইল, স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইল, পাপ পুণ্য এক হইল,—আমি কাণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কা চ বার্ত্তা?" তখন কার বার্ত্তা কে রাখে, এমন সুখের সময়ে, এমন বিরহান্ত মিলনের সময়েও "কা চ বার্ত্তা?"

সরোবরে চন্দ্রপ্রিয়া কুমুদিনী, আকাশে কুমুদিনী-কান্ত শশাঙ্ক; চন্দ্রকরস্পর্শে কুমুদিনী হাসিতেছে,—কখনও প্রতিবিম্বাকারে তাহার পাদদেশ স্পর্শ করিতেছে, দেখিতে দেখিতে ষট্পদগণ কুমুদিনী-হৃদয় অধিকার করিয়া মধুপানে ব্যাপৃত হইল, কলঙ্কী শশাঙ্ক সমস্ত রাত্রি তাকাইয়া তাকাইয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়া অস্তাচল অবলম্বনে উদ্‌যোগী হইলেন; আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "কা চ

বার্ত্তা ;” ভ্রমর তখন ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল ; শশাঙ্ক তখন পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া মরিল, কুমুদিনী তখন শিশিরাশ্রু বর্ষণ করিয়া, প্রভাত-বাতনিশ্বাসে নিজের দুঃখ, সহচরী ঊষার নিকট প্রকাশ করিতে লাগিল! আমার কথার উত্তর কেহই করিল না। অতএব, বাছা যুধিষ্ঠির, তুমি বলত, “কা চ বার্ত্তা ?”

উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এই সংসার একটী মোহময় কটাহস্বরূপ, কাল নিরন্তর এই কটাহে প্রাণিগণকে পাক করিতেছে। যাঁহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া আপনাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী ভাবিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, প্রবীণতার ভাণ করিয়া চারিদিকে মূর্খতা বিস্তার করিতেছে, সত্যকথনের ছলে মিথ্যার প্রসর বৃদ্ধি করিতেছে, এই মোহময় কটাহ তাহাদিগের পরিণতি স্থল। মোহের বশে —কে কি না করিতেছে ? ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, মোহের ফল ; ক্রোধ, হিংসা, মোহের ফল ; প্রবঞ্চনা, প্রতারণা মোহের ফল। মোহবশে যুবক যুবতীর

অধঃপতন, অথবা যত স্থলে যতরূপ চরিত্রস্খলন দেখিতে পাওয়া যায়, মোহই তাহার কারণ। তাই বলিলাম, সংসারটী একটী মোহময় কটাহ। এই কটাহে প্রাণিগণ নিরন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে।

মোহাচ্ছন্ন প্রাণিগণ কোনরূপে শান্তি পায় না। সূর্য্য তাহাদের চক্ষে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি-কুণ্ড! সূর্য্যের তাপে সংসারটা যেন তাহাদের চক্ষে সর্ব্বদা সন্তপ্তই আছে। দিন বল, রাত্রি বল,—সকলই সেই মহাকুণ্ডের ইন্ধন! মাসের পর মাস যাইতেছে, ঋতুর পর ঋতুর যাইতেছে, অনুতাপতপ্ত প্রাণিগণ দুঃখবহুল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে দেখিলে মনে হয়, যেন মহাকাল, হাতা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া প্রাণিগণকে মোহ কটাহে ফেলিয়া ভাজিতেছে। পিতঃ, তোমাকে আমি আর কি উত্তর করিব, সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে,—

"ঘোটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা,
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা,
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা,
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা।"

"কিমাশ্চর্য্যম্ ।"

র্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কিমাশ্চর্য্যম্ ?" জগতের যে দিকে তাকাই, সে দিকেই আশ্চর্য্য; সব যেখানে আশ্চর্য্য, সেখানে জিজ্ঞাসা কেন—"কিমাশ্চর্য্যম্ ?" কোন্‌টী যে "আশ্চর্য্যম্" নয়, তাহাই বরং ভাবিবার কথা, এরূপ স্থলে, কিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় "কিমাশ্চর্য্যম্ ?"

নির্ম্মল নীল গগনে শশধরের শোভা দেখিয়াছ কি ? কুসুমোদ্যানে বিকশিত কুসুমের সৌরভ অনুভব করিয়াছ কি ? সমীরণ-হিল্লোলে মন্দা-

কিনীর তরঙ্গ-লীলায় মুগ্ধ হইয়াছ কি? অমৃতের মধুর আস্বাদে আত্মাকে চরিতার্থ করিয়াছ কি? তুমি দেব হও, মানব হও, পশু হও, পক্ষী হও, আমার কথার উত্তর দাও,—বল, বিধাতার সৃষ্টিতে চন্দ্র, কুসুম, নদী, অমৃত আশ্চর্য্য কি না? এই সকল সম্মুখে থাকিতে আবার জিজ্ঞাসা কেন,—"কিমাশ্চর্য্যম্?

প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখিয়া অনেক দিন ভাবিয়াছি—"কিমাশ্চর্য্যম্!" কত দিন প্রান্তরে বসিয়া সুন্দর চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিয়াছি,—চাঁদটী যদি এত সুন্দর, ত' তাহার হৃদয়টা এত কলঙ্কিত কেন? কতদিন কুসুমোদ্যানে বসিয়া ভাবিয়াছি, গোলাপের যদি এতই রূপলাবণ্য, ত' তাহাতে কণ্টক কেন? কতদিন মন্দাকিনীতীরে বসিয়া ভাবিয়াছি, তাহার যদি এতই রমণীয়তা ত' তাহাতে নক্রভীতি কেন? কতদিন অমৃতের মাধুর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া ভাবিয়াছি, অমৃতের যদি এতই মধুরতা, ত' তাহাতে গরল কেন? বিধা-

তার এমন সাধের চাঁদে কলঙ্ক! এমন মনোহর গোলাপে কণ্টক! এমন আনন্দবাহিনী মন্দাকিনীর প্রসন্নসলিলে নক্রভীতি! এমন মৃতসঞ্জীবন অমৃতে জীবনহর গরল! ইহার পরও কি বলিতে হইবে "কিমাশ্চর্য্যম্ ?"

প্রকৃতির কথায়ই বা কাজ কি? একবার ইতিহাসের আলোচনা কর না কেন? সীতা কি পাপ করিয়াছিলেন যে, আজীবন এত কষ্ট পাইলেন! সাবিত্রী কি পাপ করিয়াছিলেন যে, বৈধব্যের ভীষণ ছায়া দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শতসহস্র বৎসর নরক-বাসের কষ্ট পাইলেন!

এ সকল ভাব, আর ভাব,

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ।"

সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া বল, "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ?

আবার ভাব,—নল কোন্ পাপের ফলে বনে বনে ঘুরিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিলেন? কোন্ পাপের ফলে লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইল? কোন্

পাপের ফলে রামের বনবাস হইল? কোন্ পাপে ভীষ্মের শরশয্যা? কোন্ পাপে দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদ? এই সকল মহাপুরুষের চরিত্রকাহিনী ভাব, তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলির চিন্তা করিয়া আমায় বল,—"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্?"

একবার সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সরল শিশুর সরল হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষের চিহ্ন নাই, কপটতার লক্ষণ নাই, মিথ্যা প্রবঞ্চনার সম্পর্ক নাই। কিন্তু, নিশ্বাসোষ্মায় স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, দুর্জ্জনসম্পর্কে সেই স্বচ্ছ হৃদয়ও মলিন হয়; পবন হিল্লোলে স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তরঙ্গাবলির ন্যায়, স্বচ্ছ শিশুহৃদয়ও কুচিন্তানিল সম্পর্কে কলুষতরঙ্গে আকুল হয়; যাহার সরলতা দেখিলে প্রাণ স্নিগ্ধ হইত,—তাহার কুটিলতার কথা ভাবিলেও প্রাণটা চঞ্চল হয়; যাহাকে মণির হার ভাবিতাম, সে একটী বিষম ফণি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিলেও হৃদয় দগ্ধ হয়! শিশুর অমৃতময় হৃদয়েও কাল-কূট প্রবেশ করিল! ধর্ম্মের পবিত্র আবাসেও

পাপের আধিপত্য স্থাপিত হইল! অতঃপরও কি বলিতে হইবে "কিমাশ্চর্য্যম্ ?"

ইহার উপরও যদি দেখিতে চাও, "কিমাশ্চর্য্যম্" তবে, আমার সঙ্গে আইস। ঐ যে ধূ ধূ করিয়া সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, উহা শ্মশান। উহাই মানব-জীবনের পরিণতিস্থল! ধনোন্মত্ততা, রূপোন্মত্ততা, প্রেমোন্মত্ততা, সকলেরই পরিণতি এই স্থানে! পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর, ধার্ম্মিকতার আড়ম্বর, বদান্যতার আড়ম্বর,—সকলই এখানে নিঃশেষ হইবে! রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এই শশ্মান সকলেরই অন্তশয্যা। দুই দিন পরে হউক, আর চারি দিন পরেই হউক, এখানে সকলেরই পার্থক্য, বৈষম্য লোপ পাইবে, কিন্তু তথাপি জগতে এত পার্থ্যক্য! এত বৈষম্য! বল দেখি,—"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ?"

এই শ্মশানে বসিয়া একবার অতীত শ্মশানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই শ্মশানে কত প্রণয়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, কত অভিসারিকার আতঙ্ক আশঙ্কা,

কত বিলাসিনীর বিলাস বিভ্রম, কত অনুতপ্তের হৃদয়-সন্তাপ বহ্নিজ্বালায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কথা একবার ভাব। অতীত কালের দেবর্ষিগণ মহর্ষিগণ রাজর্ষিগণ কোথায় গেলেন, তাহাও একবার ভাব! শ্মশান-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখ, রাম সীতাকে দেখিতে পাও কি না, সাবিত্রী সত্যবান্‌কে দেখিতে পাও কি না, অরুন্ধতী-বশিষ্ঠকে দেখিতে পাও কি না। তাঁহাদের সরলতা, বিনীততা, পবিত্রতা, দৃঢ়ব্রততা, সত্যপরায়ণতা ও অকৃত্রিমতার উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিতেও কুটিলতা, দুর্বিনীততা, অপবিত্রতা, চঞ্চল-চিত্রতা, অসত্যশীলতা ও অকৃত্রিমতা মানবের হৃদয় অধিকার করিতেছে, বল দেখি—"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ?"

আত্মহত্যা মহা পাপ! আত্মঘাতীর স্থান নরকেও নাই! তোমার চতুর্দ্দিকে এক বার অবলোকন কর, দেখ কত লোক কত প্রকারে আত্মহত্যায় অগ্রসর! ঐ যে বিশ্বভণ্ডগণের মুখ-

মণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল বিনির্গত সুধা লহরীর ন্যায়, উপদেশলহরী ক্ষরিত হইতেছে,—উহারা এক এক জন আত্মঘাতী! উহারা স্বার্থের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, গূঢ় অভীষ্ট সাধনের অভিপ্রায়ে আত্মহত্যা করিয়াছে! উহারা সরলতা, সত্যপরতা, ধার্ম্মিকতা স্বার্থের নিকট বলি দিয়াছে,—সরল, সত্যপর, ধর্ম্মভীরু আত্মাকে উহারা হত্যা করিয়াছে! উহারা যদি মহাত্মা হয়, তবে নীচাত্মা কে? উহারা যদি জ্ঞানী হয়, তবে মোহান্ধ কে? উহারা যদি ধার্ম্মিক হয়, তবে মহাপাপী কে? উহারা যদি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়, তবে, নরকের কীট কে হইবে? অগ্নিশিখার রূপে বিমুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায়, কত নরনারী উহাদের রূপ কূপে নিমগ্ন হইতেছে, নিষাদের মধুর মুরলী নিনাদে মোহিত হরিণীর ন্যায়, উহাদের মধুর স্বরে বঞ্চিত হইয়া আত্মঘাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে! তাহা কে বলিবে? এই সকল কথা যখন ভাবি, তখনই মনে হয়,—"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্?"

কাল যাহাকে দেখিয়াছি, সে আজ নাই! কোথায় গেল? যমালয়ে! প্রতিদিন অসংখ্য নর-নারী যমালয়ে যাইতেছে। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, মৃত্যু আমাদের নিকটে আসিবে না; চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব, সত্য মিথ্যা, আচার অনাচার, যাহাই অবলম্বন করি না কেন; পরদ্রোহ, পরোপকার যাহাই আচরণ করি না কেন,—সুখে থাকিতে পারিলেই হইল! এই সুখের পরিণাম যে দুঃখ, এই অমৃতের পরিণাম যে গরল, এই স্বর্গের পরিণাম যে নরক, একথা আমরা কেহই ভাবি না। ভাবি না বলিয়াই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা, তারা ইহা মনে করে—
আপনারা চিরজীবী না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য কহ মহাশয়?"

কঃ পন্থাঃ ?

বিঘোরে বিপাকে পড়িয়া নিরন্তর ভাবিতেছি, "কঃ পন্থাঃ ?" এ যে বিষম গোলক ধাঁধা ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইতেছি, গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিতেছি না, তাই সুদীর্ঘ উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভাবিতেছি, "কঃ পন্থাঃ ?"

কাহাকে শুধাইব—'কঃ পন্থাঃ ?' কে আমায় বলিয়া দিবে, 'কঃ পন্থাঃ ?' কে যে সে স্থানে গিয়াছে জানি না, কে যে সে স্থানের পথ অবগত আছে, তাহাও জানি না, সুতরাং কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—"কঃ পন্থাঃ ?"

আমি অনেককে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছি; অনেকে আমাকে পন্থা দেখাইয়াছেন, অনেকে আমাকে ঘুরাইয়াছেন, তাই কাহারও প্রতি আর নির্ভর না করিয়া, শূন্য মনে বলিতেছি "কঃ পন্থাঃ ?"

আমি কাহাকেও দোষ দিই না, কপালের দোষে ঘুরিয়াছি, কপালের দোষে অবসন্ন হইয়াছি। স্বার্থপর জগতের স্বার্থপর লোকের কথায় বিশ্বাস করিলাম কেন, মুর্খজগতের মুর্খ লোকের গর্ব্বিত বাক্যে নির্ভর করিলাম কেন, অন্ধ জগতের অন্ধ লোককে পথ দেখাইতে বলিলাম কেন? যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট,—আর তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব না "কঃ পন্থাঃ?" তোমরাও আমায় বলিও না "কঃ পন্থাঃ।"

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"কঃ পন্থাঃ ?" চারিদিক হইতে নানারূপ পথের কথা শুনিতে পাইলাম, কেহ উত্তরে, কেহ দক্ষিণে, কেহ পূর্ব্বে,

কেহ পশ্চিমে, হিমালয়ের পথ দেখাইয়া দিল—সকলেই যে সর্ব্ববিৎ! যাহার বিংশতি পুরুষ হিমালয়ের নামও করেন নাই, তিনিও ভারতের দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন,—"হিমালয়ের ঐ পন্থা?"

আমি সব দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া আছি,—যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে ত পথ দেখাইয়া দেয়ই, যাহাকে জিজ্ঞাসা না করি সেও পথ দেখাইয়া দেয়। অনেকের যে পথ দেখানই ব্যবসায়, না দেখাইলে চলিবে কেন? এক দিন, (স্বকর্ণে শুনিয়াছি) একটী জোড়া চশমা আর আবক্ষোবিলম্বিত দাড়ী মাত্র পুঁজি লইয়া স্বর্গ-ধামের পথিক, আমার ন্যায় ভ্রান্ত পান্থদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—তোমরা কুপথে চলিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, আমার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন কর, মনু কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর, স্মৃতি-শাস্ত্র কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর, পুরাণতন্ত্র কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর!"

এমন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াও বুঝিলাম না,—"কঃ পন্থাঃ ?" বুঝিলাম, বক্তা ভ্রান্ত, অন্ধ, উন্মত্ত; বুঝিলাম, তাঁহার আত্মা বিদ্বেষবিষে-জর্জ্জরিত, স্বার্থহানির আশঙ্কায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া, স্বর্গীয় মহর্ষিগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কথা বলিয়া নিজের নরকের পথ প্রশস্ততর করিতেছেন। বুঝিলাম, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ পাষণ্ডের অবলম্বনীয়, নারকীর অবলম্বনীয়, পিতৃদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী, সমাজদ্রোহীর অবলম্বনীয়! বুঝিলাম না, আমাদের পক্ষে "কঃ পন্থাঃ ?"

উপদেশে বীতরাগ হইয়া স্বয়ং অন্বেষণ করিলাম,—"কঃ পন্থাঃ ?" সমাজে পথ খুঁজিতে যাইয়া নানা রহস্যের উদ্ভেদ করিলাম। সেখানে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে! বিলাসী বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছে! নাস্তিক ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে! মিথ্যাবাদী সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছে! ভণ্ড সাধুতা দেখাইতেছে! ঘোর দাম্ভিক বিনয়োপদেশ প্রচার করিতেছে! এই সকল

দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম আর কেন খুঁজিয়া মরি "কঃ পন্থাঃ?" জগতের পন্থা ত ইহারাই নির্দ্দেশ করিতেছে!

ব্যাপার দেখিয়া এক দিন মনে হইল যেন রম্ভা তিলোত্তমা সীতা সাবিত্রীকে সতীত্ব উপদেশ দিতেছে,—দুর্ব্বাসা নারদকে ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝাইতেছেন, দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে মৈত্রী শিক্ষা দিতেছেন। ভাবিলাম আর কেন খুঁজি "কঃ পন্থাঃ?" জগতে থাকিতে হইলে উহার যে কোন একটা অবলম্বন করিলেই ত চলিবে।

পড়িয়া দেখিলাম এক শাস্ত্র বলিতেছেন— "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" অন্য শাস্ত্র বলিতেছেন— "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" এক শাস্ত্র বলিতে-ছেন—"সত্যং বলং কেবলম্" "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" অন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।" এখন বলুন দেখি "কঃ পন্থাঃ?" আবার শাস্ত্রেই পড়িলাম বেদ চারিটা, স্মৃতি কুড়িটা, মুনি অনন্ত, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথও অনন্ত। এখন বলুন

দেখি, কোন্ পথে যাই? বুঝিতে পারিলাম না, এরূপ পন্থা-বিভ্রাটে ভ্রান্ত পান্থের পক্ষে "কঃ পন্থাঃ?"

এখন আমি কোন্ পথে যাই? যাঁহারা স্বার্থের লোভে ধর্ম্ম ছাড়িয়া, সত্য ছাড়িয়া, ন্যায় ছাড়িয়া, পাপময়, অসত্যময়, প্রতারণাময়, পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে, তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব, অথবা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট একটী পন্থা বাছিয়া লইব? এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া নিরন্তরই ভাবিতেছি—"কঃ পন্থাঃ?"

সুবিধা দেখিতে হইলে, প্রাচীন মহর্ষিগণের কথা ছাড়িয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া, নূতন পথে যাওয়াই উচিত। স্বর্গের পথে ভারি কষ্ট—সঙ্গী পাওয়া যায় না! নরকের পথে কোন কষ্ট নাই, সটান নামিয়া যাও। স্বর্গের পথে কখনও উপবাস করিতে হয়, কখনও অনাবৃত স্থানে বাস করিতে হয়, পিতামাতাকে খাইতে দিতে হয়, পরের দুঃখে কাঁদিতে হয়, সর্ব্বদা সত্য

কথা কহিতে হয়। এইরূপ কতই ঝঞ্ঝাট! নরকের পথে সে সব কিছু নাই; পিতা-মাতার ভাবনা নাই, ব্রত উপবাস করিতে হয় না। আবার সুবিধা কত, সঙ্গীর অভাব নাই। ঐ দেখ, কত হোমরাচোমরা চলিয়াছে, কত রম্ভা তিলোত্তমা, উর্ব্বসী মেনকা পথ আলো করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে! আতর গোলাপ পমেটম্ লেবেণ্ডারের গন্ধে প্রাণ মাতাইতেছে! এমন পথ সম্মুখে থাকিতেও অর্ব্বাচীন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—"কঃ পন্থাঃ?"

অবোধ মন যে আমার বুঝে না! সে যে দাড়ী চশমার মর্ম্ম বুঝে না, টিকি নামাবলীর মর্ম্ম বুঝে না, রম্ভা তিলোত্তমা চিনেনা, পমেটম্ লেবেণ্ডার জানে না,—অতীত কালের জ্যোতির্ম্ময় দেবোপম মহর্ষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চায়—তাঁহাদের চন্দনচর্চ্চিত দেহের স্বর্গীয় সৌরভে মুগ্ধ হইতে চায়, তাঁহাদের দেহপ্রভায় আলোকিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সুরলোকে

অগ্রসর হইতে চায়,—সেই পন্থা অন্বেষণ করিয়া পায় না, অাই নির্জনে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন করে, ভাবে—এখন অভীষ্টসাধনের "কঃ পন্থাঃ?"

বিভিন্ন বেদ বিভিন্ন পন্থা দেখাইতেছেন, বিভিন্ন স্মৃতি বিভিন্ন পন্থা দেখাইতেছেন, বিভিন্ন মুনি বিভিন্ন পন্থা দেখাইতেছেন, কোন্‌টী অবলম্বন করিব? কোন্ পথটী ধরিলে অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারিব? সব কয়টীই এক স্থানে গিয়াছে,—সরল কুটিল ভেদে, বিভিন্ন মাত্র!—আমার পক্ষে যে "কঃ পন্থাঃ" কে বলিয়া দিবে?—অন্তরের অন্তরাল হইতে কে যেন বলিয়া দিল—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

"কশ্চ মোদতে ?"
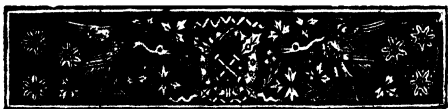
এই হাহাকার পূর্ণ ভারতে এ প্রশ্ন আর শোভা পায় না! চারিদিকে হাহুতাশ! চারিদিকে শ্মশান! চারিদিকে আতঙ্ক! চারিদিকে আশঙ্কা! এখানে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব "সুখী কে?" কে আমায় উত্তর দিবে সুখী কে? আজ সে ভারত নাই, সে যুধিষ্ঠির নাই, সে সুখ নাই, সে সুখী নাই;—তবে আমায় কে বলিবে, কেমন করিয়া বলিবে, "সুখী কে?"

চোর চুরি করিতে পারিলেই সুখী, বঞ্চক প্রতারণা করিতে পারিলেই সুখী, ভণ্ড ধার্ম্মিক

সত্যবাদী, নিরপেক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিলেই সুখী। আমি সে সুখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমার মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যে জন মরমের যাতনা বুঝ, যে জন দুঃখের, গভীরতা বুঝ, যে জন সুখের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছ, সে আমায় বল গো, "সুখী কে ?"

রাধিকা সহস্র ছিদ্র কলসীতে জল আনিয়া নিজের অলোকসামান্য সতীত্ব খ্যাপন করিলে আয়ান ঘোষ যে সুখে সুখী হইয়াছিলেন, সপ্ত-রথীর সমরে অভিমন্যু নিহত হইলে দুর্য্যোধন যে সুখে সুখী হইয়াছিলেন, শিখণ্ডীর বিক্রমে ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিয়া যুধিষ্ঠির যে সুখে সুখী হইয়াছিলেন, সে সুখের কথা আমি বলিতেছি না। সে সুখকে যে মানুষে সুখ বলে না, সে যে আত্মার ঘৃণিত তৃপ্তির ভীষণ ছায়া! সে যে বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোক, ক্ষণকাল পরেই দারুণ অন্ধকার! ক্ষণকাল পরেই, অশান্তি, আশঙ্কা,

অনুতাপ, অনুশোচনা! তাই বলিতেছি আমি সে সুখ, সে সুখীর কথা বলিতেছি না। যদি জান, তবে বল না, সুখী কে? নির্ম্মল সুখের অধিকারী কে?

আজ যে দুর্ভিক্ষে সমস্ত দেশটা শ্মশান হইতে চলিয়াছে, সকলেই যে সে আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছে, সকলেরই যে মুখে বিষাদের ছায়া হৃদয়ের দুঃসহ যাতনা প্রকাশ করিতেছে,—দেখিয়া পরদুঃখ কাতর মহাত্মাদের মর্ম্মগ্রন্থি শতধা ছিন্ন হইতেছে; ইহা দেখিয়াও যে প্রাণীর হৃদয় লাভের আশায়, স্বার্থসাধনের আশায় বা প্রতিপত্তি লাভের আশায়, সুখ অনুভব করে, সেও কি মানুষ? তাহার হৃদয়ের বৃত্তিত মানুষের নহে, তাহার সুখ পিশাচের, তাহার তৃপ্তি রাক্ষসের, তাহার আত্মপ্রসাদ দানবের—তাহার সুখের কথা বলিয়া আমায় "সুখী" চিনাইও না। আমার মনের কথা বুঝিয়া বল, "সুখী কে?"

বলত, বিশ্বামিত্র সসাগরা পৃথিবীর অখণ্ড

আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন; কি, রাজ্য-লোভে "হত-ইতি-গজ" বলিয়া আজন্ম-সঞ্চিত যশোরাশিতে কলঙ্ককালিমা লেপিয়া ব্রহ্ম-হত্যার দারুণ পাপভার মস্তকে করিয়া যুধিষ্ঠির সুখী হইয়াছিলেন? বলত, ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে সুখী কে? আমি বুঝি না, তাই তোমা-দিগকে সুধাইতেছি, আমায় বলিয়া দাও সুখী কে? বুঝিতে পারিতেছি না, সাধুতার অকিঞ্চনত্বে সুখ, কি বঞ্চনার রাজত্বে সুখ? বুঝিতে পারিতেছি না, নির্জ্জনে পর্ণ-কুটীরে শান্তিময় জীবন বহনে সুখ, না জনকোলাহলপূর্ণ নগরে হর্ম্ম্যের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া শত শত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিষম তাড়নে নিতান্ত চঞ্চল জীবনবহনে সুখ! তাই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বল না,—"কশ্চ মোদতে?"

বনে যাইলে যদি সুখী হইতে পারি, তবে, আমি তাহাতেও প্রস্তুত, সাগরে ডুবিলে যদি সুখী হই, আমি তাহাতেও প্রস্তুত, আত্মহত্যা করিলে

যদি সুখী হই, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নই, তাই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বল, সুখী কে? কিন্তু দারুণ বৈরনির্য্যাতন স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকবার মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছি, কৈ সুখের মুখ ত দেখিলাম না!

মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নাই। শুধু নির্ম্মল সুখটুকু লাভের প্রত্যাশায়, শত্রুর শ্মশান-বহ্নির সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ অবলোকন কামনায়, হয় কে নয় করিয়াছি, কিন্তু তথাপি সুখ ত মিলিল না। মুক্তার আশায় সাগর সেচিয়া শুক্তি পাইলাম, অমৃতের আশায় মেঘের প্রার্থনা করিয়া, বজ্রাঘাত সহ্য করিলাম, শত্রুর শ্মশানের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া নিজের হৃদয়ে, আকল্পস্থায়ী শ্মশানবহ্নির সংস্থাপন করিলাম! দারুণ অনু-তাপ মনস্তাপ এখন আমার একমাত্র সম্বল! যে সুখের আশায় এত করিলাম, তাহা মিলিল কৈ? সুখী হইতে পারিলাম কৈ?

বলিয়া দাও, "সুখী কে?" যিনি সুখী,

আমি তাঁহার কাছে যাইব, সুখ লাভের উপায় জানিয়া লইব, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুখান্বেষণে বহির্গত হইব। তাঁহার নিকট সর্ব্ব-প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার ভণ্ডামি দেখিয়া তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করুন, আমার মিথ্যাবাদের ইঙ্গিত করিয়া কুটিল কটাক্ষ করুন, আমার প্রতারণার কথা তুলিয়া তিরস্কার করুন, অম্লানবদনে সমস্ত সহ্য করিব, সুখের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি জানিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব, পরিশ্রম সফল বোধ করিব, তাই তোমায় করযোড়ে বলিতেছি, বলিয়া দাও এ জগতে, "সুখী কে?"

রাজার ভাণ্ডারের রত্নরাশিতে সুখ লুক্কায়িত আছে কি? যদি তাহা থাকিত, তবে বিশ্বামিত্র রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় ঘুরিবেন কেন? শাক্যসিংহ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষু-বেশে ফিরিবেন কেন? যুধিষ্ঠির বহু ক্লেশোপার্জ্জিত রত্নরাজি পরিত্যাগ করিয়া সুখান্বেষণে বহির্গত

হইবেন কেন? পাণ্ডিত্যে সুখ আছে কি? কৈ চৈতন্যত অনুপমপাণ্ডিত্যে সুখলাভ করিতে পারেন নাই। যদি রাজত্বে সুখ নাই, পাণ্ডিত্যে সুখ নাই, তবে কিসে সুখ, কে বলিবে? কে সুখী, কে বলিবে?

আমি সুখের জন্য পাগল! চারিদিকে সুখ সুখ করিয়া ঘুরিতেছি, সুখের সন্ধান পাইতেছি না। এক দিন প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অশ্বথছায়ায় শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছিলাম, হঠাৎ তন্দ্রা-বির্ভাব হইল,—কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—

"সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ।"

প্রাণের ভিতর যেন সুধার ধারা বহিল, হতাশ প্রাণে যেন আশার সঞ্চার হইল,—এত দিনে যেন সুখের প্রকৃত মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইল! বুঝিলাম, আসক্তি সুখের অন্তরায়, বৈরাগ্যই সুখের

সাধন। বুঝিলাম, অট্টালিকা বা তরুতল, পর্য্যঙ্ক বা ধরাতল,—সুখের সাধক ও নহে, নাশকও নহে। হৃদয়ই সুখের জন্মভূমি, বিরাগ তাহার সাধক, অতৃপ্তি তাহার নাশক। বুঝিলাম, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রবঞ্চনা প্রতারণার প্রশ্রয় না দিয়া সন্তুষ্ট থাকাই সুখ লাভের প্রশস্ত উপায়। এত দিনে বুঝিলাম, বকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির কেন বলিয়াছিলেন,—

"অপ্রবাসে অ-ঋণে যাহার কাল যায়
যদ্যপি পরাহ্লকালে শাক অন্ন খায়;
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর—

*   *   *   *

আমার স্বপ্ন।

স্বপ্ন কেন দেখি, তাহা আমি জানি না, তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতেও আমি চাই না। স্বপ্ন কি, তা সকলেই জানেন, আমিও জানি; তবে, তাহার প্রকার এক কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, তাই জিজ্ঞাসা করি আমার স্বপ্ন আর আপনাদের স্বপ্ন এক কি?

শুনিতে পাই লোকে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে, জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নের কথা কেহ কখনও বলেন নাই। আমিত জাগ্রদবস্থায়ই বেশী স্বপ্ন দেখিতে পাই! নিদ্রিত অবস্থায়, সুষুপ্তির কৃপায় অনেক

দিন এমনও হয় যে, স্বপ্ন দেখিলাম না, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় ত কখনই ফাঁক যায় না। তাই জিজ্ঞাসা করি, আমার মত স্বপ্ন আপনারা কে কে দেখিয়া থাকেন, বলুন দেখি?

আমার দিবা স্বপ্ন, বিভীষিকাময়, প্রহেলিকাময়! উহা চিন্তার প্রবলতরঙ্গে মগ্নোন্মগ্ন করিতে করিতে আমাকে যে কোথায় লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা বুঝিতে পারি না।

শৈশবে শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে শুইয়া কত-দিন কত সুখ-স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্নের কৃপায় কত অদৃষ্টচর মনোহর স্থান দেখিয়াছি, কত দুরাস্বাদ্য সুধার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, কত অভূতপূর্ব্ব সঙ্গীতমাধুর্য্যে স্বর্গীয় প্রীতি অনুভব করিয়াছি, কত পারিজাত-সৌরভে আত্মহারা হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। নিদ্রাভঙ্গে এমন বোধ হইয়াছে, যেন স্বর্গের নন্দনকাননে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ পাতা-লের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কুক্ষিতে নিমগ্ন হইলাম, যেন

রম্ভা তিলোত্তমার সঙ্গীত-সুধা পান করিতে করিতে হঠাৎ সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভৈরবনাদপরিপূরিত কানন-গর্ভে বিলীন হইলাম। কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন!

শৈশবের সেই সুখস্বপ্ন আর নাই! তখন স্বপ্ন-ভঙ্গে কষ্ট হইত, এখন স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বাঁচিয়া যাই। তখনকার স্বপ্নে, সুখ শান্তি, আশা তৃপ্তি সকলই ছিল; এখনকার স্বপ্নে দুঃখ, চিন্তা, অস্থিরতা উদাসীনতা ভিন্ন আর কিছুই নাই;—তাই বলিতেছিলাম, আমার স্বপ্ন এখন কেবল ঘোর বিভীষিকা ময়!

ইচ্ছা হয়, আর স্বপ্ন দেখিব না; যাহার কথা মনে হইলে প্রাণটা নিরন্তর কাঁপিতে থাকে, তাহা হইতে দূরে থাকাইত ভাল। কিন্তু এ স্বপ্ন যে এড়াইবার যো নাই। এ যে জাগ্রদবস্থার স্বপ্ন! জাগিয়া থাকিলেই দেখিতে হইবে,—চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ পৃথিবী, সকলই যে এ নিদারুণ স্বপ্নের উৎপাদক। কাহার হাত এড়াইব? পার্থিব পরমাণু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত,

একটী জল-কণিকা হইতে মহাসাগর পর্য্যন্ত, একটী ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে তিমি-তিমিঙ্গিল পর্য্যন্ত, অথবা সচরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার এ স্বপ্নের প্রবর্ত্তক! কাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব?

চন্দ্রমার কিরণ-মালায় বিভুষিত হইয়া নভো-মণ্ডল হাসিতেছে,—এ হাসি দেখিয়া যে ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করিতে পারে, তাহার প্রতি ভগবান প্রসন্ন; কিন্তু আমার ত সে পুণ্যবল নাই, ভগবান্ ত আমাকে সে সুখানুভবের অধিকারী করেন নাই, সুতরাং চাঁদের মধুর-কান্ত-কিরণকলাপে আমাকে তৃপ্ত করিতে পারিবে কেন,—চন্দ্রদর্শনে যাহার হৃদয়ে দুঃখসাগর উদ্বেল হয়, মনে হয়, —কেমন করিয়া বলিব! বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, কি মনে হয়, তোমায় কেমন করিয়া বলিব? আমার সাধের পুতুলটী, প্রেমের ছবি খানি, লাবণ্যের প্রতিমাখানি, এখন কোথায়? যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তোমাকে হাতে পাইতাম, চাঁদ, তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিলে?

যে কথায় কথায় তোমাকে ধরিয়া আনিয়া আমাকে দান করিত, আজ তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? যাহার অবস্থানে তোমাকে অমৃতাধার মনে করিতাম, অদ্য তাহার অভাবে তুমি আমার পক্ষে গরলাধার। তুমি যে ছিলে, এখন আর সে নাই; এ কি দারুণ স্বপ্ন নয়!

অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে আর স্বপ্নে যে প্রভেদ কি, তাহা আমার বোধগম্য হয় নাই। শৈশবের লীলাখেলা এখন স্বপ্নকাহিনী, বার্দ্ধক্যের বিষয়-বৈরাগ্য এখন স্বপ্নকাহিনী, অতীত স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ ও স্বপ্ন; শুধু কি বর্ত্তমানটী স্বপ্ন নয়? অদ্য যাহা বর্ত্তমান, গত কল্য তাহা স্বপ্ন ছিল, আগামী কল্যও তাহা স্বপ্ন হইবে, তবে আজ স্বপ্ন নয় কেন?

এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্ত স্বপ্নময়। এক দিনমাত্র পূর্ব্বে যে কুসুমটী সৌরভে তোমাকে আকুল করিয়াছিল, আজ তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, আর সে রূপচ্ছটা নাই, আর সে রূপগৌরব

নাই। তাহার রূপ কোথা হইতে আসিল, কোথায় চলিয়া গেল, কে আনিল, কে লইয়া গেল, আমাকে কেহ বলিয়া দিবে কি? আমিত বলি সব স্বপ্ন, একবার স্বপ্ন দেখিলাম—ফুল ফুটিল, একবার দেখিলাম—ফুল শুকাইল।

এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ভূচর, খেচর যাহা কিছু দেখি বা ভাবি, সবই স্বপ্নময়। নির্ম্মলই হউক, আর মেঘাচ্ছন্নই হউক, আকাশের দিকে তাকাইয়া কত কি ভাবিয়াছ বলিতে পার কি? স্বপ্ন ধরিবার উপায় থাকিলে তাহা পাইতে পারিতে, রাখিতে পারিতে, কিন্তু স্বপ্নত ধরা যায় না।

এক দিন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অশ্বত্থ-শীর্ষে কিশলয়-শোভা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, এমন শোভা দেখিয়া প্রাণটা উচাটন হইল কেন? এক দৃষ্টে সেই শোভা দেখিতে দেখিতে উদাস প্রাণে কতরূপে কল্পনার কত রাজ্যে বিচরণ করিয়াছিলাম, বলিতে পারি কি? অচিরে নৈশধ্বান্ত কৃতান্তবেশে আকাশের প্রান্তস্থিত সন্ধ্যাসৌন্দর্য্য

গ্রাস করিল, আমার প্রাণটা যেন একেবারে তমসাচ্ছন্ন গুহার অন্তর্লীন হইল,—এইমাত্র সন্ধ্যা-রাগের মৃদুমধুর প্রভা, আর এইমাত্র অন্ধকারের করাল আকৃতি, একি স্বপ্ন নয়?

মানব-জীবন নাকি বড়ই সুখকর! হউক, না হউক, সকলেই এই কথা বলেন। কেন বলেন, জানি না;—নিরন্তর স্বপ্ন দেখিতে পান বলিয়া কি? মানব-জন্ম যাঁহার পক্ষে সুখকর তিনি সুখ ভোগ করুন। তাঁহার সুখ নষ্ট করিবার অভিলাষ আমার নাই। আমার সে সুখে কাজ নাই,—স্বপ্নের সুখে যে কি সার আছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার বৃদ্ধি করে বৈ, হ্রাস করে না;—স্বপ্নের সুখে প্রকৃতই জীবনের দুঃখ-রাশি বাড়ায় বৈ কমায় না।

যখন ভাবি,—প্রকৃত জীবন কবে পাইব,—কোথায় পাইব,—তখন স্বপ্নের ভীষণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কখনও ঊর্দ্ধে অবলোকন করি, কখনও অধোদেশে অবলোকন করি। ঊর্দ্ধে

দেখিতে পাই,—দেবর্ষি, রাজর্ষি, ও মহর্ষিগণ—স্বর্ণসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তেজোময় দেহের তীব্র প্রভায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিতেছেন। সে জ্যোতিঃ, সে প্রভা অলৌকিক ; তাকাইলে, আমার মত পাপীর চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায়।

ঐ সকল তেজোময় দেহের পার্শ্বদেশে কমনীয়-কান্তি, দিব্যবপুঃ পিতৃপুরুষগণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-জাল বিস্তার করিতেছেন। দেখিয়া বড় ইচ্ছা হইল, একবার তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই। কিন্তু পারিব কেন? সে স্থানে যাইবার সোপান কই? পিতৃ-পিতামহগণ যে সোপান অবলম্বন করিয়া স্বর্গের সুখভোগে অধিকারী হইয়াছেন, তাহা দেখিতে পাই না কেন?—

হরি হরি! নিজে যে সোপান ভাঙ্গিয়াছি, তাহাই দেখিবার জন্য আজ আকুল হইয়া বেড়াই-তেছি,—অবিশ্বাস, অনাচার ও অশ্রদ্ধার সাহায্যে যে সোপানের মূল উৎপাটিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি, আজ তাহার জন্য কাঁদিতেছি। আমার

মত ভ্রান্ত কে? একবার যাহার বিনাশে আনন্দ পাইয়াছি, এখন তাহার জন্য দুঃখ করিতেছি; এ স্বপ্নের হাসি কান্নার, এ পাগলের হাসিকান্নার অর্থ কি, আমায় কেহ বলিতে পার কি?

অধোদেশের দৃশ্য বড়ই ভয়ঙ্কর! অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, কে যেন আমাকে তাহাতে নিক্ষেপ করিবার জন্য ডাকিতেছে। পাপ রাক্ষস যেন মুখব্যাদান করিয়া আমাকে তাহার তমসাচ্ছন্ন উদরে নিক্ষেপ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। নানারূপ অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ মূর্ত্তি যেন ভীষণ প্রহরণে সজ্জিত হইয়া আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছে! উঃ কি ভীষণ স্বপ্ন! আর না, আর এ স্বপ্ন দেখিতে পারি না! ভগবান্, রক্ষা কর,—আর যেন এরূপ স্বপ্ন না দেখিতে হয়, সে আশীর্ব্বাদ কর। এরূপ দারুণ স্বপ্নের যাতনা ক্ষুদ্র মানবপ্রাণ সহিতে পারিবে কেন?
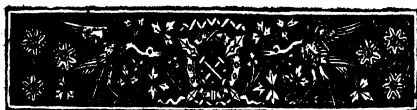
সাধের বাগান।

মনের কথা খুলিয়া বলিলে লোকে পাগল বলে। আমার মনের ভিতর অনেকগুলি কথা জমিয়াছে। পাছে লোকে পাগল বলে এই ভয়ে, সেগুলি বলিতে পারি না। কথাগুলি যে গুছাইয়া বলিতে পারি, ততটুকু শক্তি আমার নাই; সাহসও পাই না। পাগলের আবার সাহসের অভাব কি? তথাপি, সাহস না পাইবার একটু কারণ আছে, কতকগুলি এমনি কথা আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, যাহা স্মরণ করিলেই হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে থাকে, অন্তরাত্মা একেবারে শুকাইয়া যায়।

এক বার ইচ্ছা করি, সে ভীষণ কথা মনে আর স্থান দিব না, একেবারে তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিব; কিন্তু পারি কৈ? যতই দূর করিতে চেষ্টা করি, ততই যেন তাহার বিভীষিকা-ময়ী করাল মূর্ত্তি আমার হৃদয় যুড়িয়া বসিয়া থাকে।

সেই জন্য আমি সে কথাগুলির উপর অন্য কথার বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছি, আশা—যদি অন্য কথার অন্তরালে থাকায় বিভীষিকাময়ী কথার করাল মূর্ত্তি নয়নগোচর না হয়।

সমুদ্রে ডুবিয়া তৃণ অবলম্বন করিয়াও লোকে প্রাণ বাঁচাইতে চায়, আমারও সেই অবস্থা। আমি ঘৃতরাশি ঢালিয়া দাবানল নিবাইতে গিয়াছিলাম, তুলকরাশি নিক্ষেপ করিয়া কালানল প্রশমিত করিতে চাহিয়াছিলাম, ফল যাহা হইবার হইয়াছে।

“লাভঃ পরং গোবধঃ”। যে কথাগুলি, আমার প্রাণে অমৃতধারা ঢালিত; হৃদয়-কাননে পারিজাত কুসুমের সৌরভ-সম্ভার বিস্তার করিত, নিশীথ

বংশীধ্বনির মধুময়, প্রেমময়, সুধাময়, বৈচিত্র্যময় ভাবলহরী সঞ্চারিত করিত, তাহা নিজের হাতে তুলিয়া দাবানলে নিক্ষেপ করিলাম। যে কুরঙ্গ-শিশুকে হৃদয়রঞ্জন বলিয়া স্বহস্তে লালন পালন করিয়াছিলাম আজ তাহাকে স্বয়ং ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মুখে তুলিয়া দিলাম, আমি আমার প্রাণের শান্তি চাই;—হায়রে আমার বুদ্ধি!

একটী দিনের কথা বলিব;—যে ভীষণ দিনের কথা, যে শ্মশানের অগ্নিরাশি আজিও হৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সে দিনের কথা বলিব;—

শিশুকাল হইতে আমার অভিলাষ ছিল একটী বাগান করিব। যত রকম সাধ ছিল, সব সাধের একটী করিয়া চারা সংগ্রহ করিয়া বাগানে রোপণ করিলাম। বাগানের প্রসর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে তাহাতে তমাল বন, নিকুঞ্জ কানন, যমুনা-পুলিন সৃষ্টি করিলাম, বাগানে একটী সরোবরও বিকশিত-নলিনী-শোভা-বিবর্জ্জিত ছিল না। যাতি, যুথি, মল্লিকা, মালতীর সৌরভে

আমার বাগান সর্ব্বদা আমোদিত থাকিত। শরৎ-পূর্ণিমার সুধাকরের কিরণমালা আমার সৌধাবলির অঙ্গ-শোভাবর্দ্ধন করিত।

আমার বাগানে ঋতুভেদ ছিল না, বার মাস সব ঋতু সমান থাকিত। আমার চূত লতা কখনও ফলপুষ্পবিহীন হইত না, সরোবর কখনও নলিনী-শূন্য হইত না; অশোক-কানন কখনও কুসুমবিহীন থাকিত না।

কখনও বাগানটীতে মনের সাধে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম,—কখনও সহচর সমভিব্যাহারে রসাল-তলে উপবেশন করিয়া কোকিলের কুহু কুহু, ভ্রমরের গুন্ গুন্, পাপিয়ার পিউ পিউ শুনিয়া প্রাণের সাধ মিটাইতাম।

আমার নিকুঞ্জগৃহে কত যে ফুল ফুটিত, বলিতে পারি না। যখন নীলাম্বরের নক্ষত্র সমূ-হের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখিতাম, তখন ভাবিতাম, —স্বর্গের লোকেও বুঝি আমার নিকুঞ্জ গৃহের ফুলের জ্যোতিঃ এইরূপই দেখে।

ক্রমেই বাগানের শোভা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে প্রণয়িনীকে বাগানের শোভা দেখাইলাম, প্রাণের সখাকে বাগানের শোভা দেখাইলাম, প্রাণের পুতলি নয়নরঞ্জন পুত্রকন্যাকে বাগানের শোভা দেখাইলাম।

একদিন আমার বাগানের পারিজাত বৃক্ষের তলে বসিয়া ভাবিতেছিলাম,—স্বর্গ কি? নন্দন কোথায়? অমৃত কাহাকে বলে? মানস সরোবরে কি আছে? আমার এই বাগান দেখিলে আর কেহ স্বর্গ, নন্দন, অমৃত, মানস সরোবরের নাম করিবে কি?—

হঠাৎ নিবিড় জলদ-জালসুধাকরের নির্ম্মল কিরণ মাধুরী আচ্ছন্ন করিল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, অকস্মাৎ ঘোর তমস্বিনী হইয়া দাঁড়াইল;—গাঢ় অন্ধকারে আমার অশোক-কাননাভ্যন্তরে দেখিলাম, একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে,—বৈশ্বানর লহ লহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন আমার হৃদয়-নিহিত শান্তি-সুধার আস্বাদগ্রহণে লোলুপ হইয়াছে;

সেই সর্ব্বভুক বৈশ্বানর, সেই শ্মশানবহ্নি আজিও আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, আজ তারই কথা তোমায় বলিব;—এই আগুনেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যে দিন এই আগুনের দারুণ তাপে আমার হৃদয় পুড়িয়া গিয়াছে, সেই দিনের কথাই আমি তোমায় বলিব।

আমি অগ্নি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলাম। এ সর্ব্বনাশ কে করিল, আমার অশোক গাছের তলে এ দাবানল কে জ্বালিল, বুঝিতে পারিলাম না। অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলাম, তোমায় কেমন করিয়া বলিব, মনে করিতেই হৃদয় ফাটিয়া যায়! উহা আমার স্নেহময় জনকের শ্মশান!

তখন জগতের গাঢ় অন্ধকার-রাশি যেন সমস্ত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, নিবিড় জলদঘটায় বিদ্যুচ্ছটার ন্যায়, কজ্জল শৈলে সুবর্ণ রেখার ন্যায় সেই অগ্নি শিখা সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল! আজ আমার অশোক কানন, শোকের কানন হইল!

দেখিতে দেখিতে বাগানের অন্য দিকে অগ্নি-শিখা উত্থিত হইল;—ক্রমে বাগানের চারিদিকে শত স্থানে শত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

শত মহাশ্মশান হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল! কোন শ্মশানে প্রাণেশ্বরী প্রণয়িনী স্থির নেত্রে আমার মুখাবলোকন করিতে করিতে অগ্নি-দেবের জঠরে প্রবেশ করিতেছেন। কোন শ্মশানে নয়ন-পুত্তলি হৃদয়-রঞ্জন পুত্রকন্যা বৈশ্বানরের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আমাকে নয়ন-জলে ভাসাইতেছে, আবার কোন শ্মশানে প্রাণের সখা, যাহাকে না দেখিলে মরিতাম, জগৎ শূন্য দেখিতাম, প্রাণে শত বৃশ্চিক-দংশন যাতনা অনুভব করিতাম, সেই প্রাণের সখা, প্রণয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া হুতাশনের কঠোর জঠরে প্রবেশ করিতেছেন! বল দেখি, এ সকল দেখিয়াও প্রাণ কেমনে রাখি?

আমি সেই দিনের কথাই তোমায় বলিব, যে রাত্রিতে আমার সাধের বাগান মহাশ্মশান হইয়াছে, আমার আনন্দের কাননে শোকের প্রবাহ বহিয়াছে,

আমার শান্তির নিকেতনে, অশান্তির তুমুল ঝটিকার বিষম বিক্রম প্রকাশ পাইয়াছে, সেই দিনের কথা,—সেই বিষম দিনের কথা তোমায় বলিতেছি শুন ;—

সেই দিনের পর কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইল, কিন্তু আমার সে কাল রাত্রি আর পোহাইল না! আমার হৃদয়ের গাঢ়তমসাচ্ছন্ন অমানিশার আর অবসান হইল না! উষার মধুময় ছবি হৃদয়ে আর মাধুরী প্রকাশ করিল না! আমার কুসুমকাননের কুসুমরাশির মধুর হাসি আর দেখিলাম না!

হৃদয়ের আনন্দকানন আজি মহাশ্মশানময়! কুসুম-কানন মহাশ্মশান, সরোবর তীর মহাশ্মশান, কুঞ্জ কুটীর মহাশ্মশান! আমার সাধের বাগানের নাম পর্য্যন্ত মহাশ্মশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যখন বাগানের পূর্ব্ব-কাহিনী মনে হয়, তখন বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন-কাহিনীর ন্যায়, শৈশবের লীলা খেলার অপরিস্ফুট স্মৃতির ন্যায়, সুদূরাগত সঙ্গীত তরঙ্গের অস্ফুট তানের ন্যায়, আরও যেন কিসের

ন্যায়, এক অস্ফুট ভাব-প্রবাহ আমার হৃদয়ের অন্তরালে অন্তরালে ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায়, হৃদয়ান্তর্নিহিত ভাব-লহরীর অস্ফুট লীলা আমাকে আকুল করে।

সাধের বাগান অনেক দিন হারাইয়াছি; কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীর অনেক দিন শার্দ্দূলের বিলাস-ভূমি হইয়াছে। তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে,—সেই সুখকর স্মৃতির স্থান, মহাশ্মশানে অধিকার করিয়াছে, এখন আমার কিছুই নাই; এক মহাশ্মশান ছাড়া আমার বলিতে আর কিছুই নাই, কিছুর অভাবও নাই; কিন্তু তবু যেন, মনটা কি নাই, কি নাই, বলিয়া সর্ব্বদা হু হু করিতেছে! এ কি দুর্ব্বিপাক!

আমার কি নাই? কেমন করিয়া জানিব কি নাই? আকাশের দিকে তাকাইয়া, যখন তাহার নীলিমাময় অনন্ত বিস্তৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হই, তখনও ভাবি কি যেন নাই! জাহ্নবী-বক্ষে সুধাকরের কিরণমালার বিলাসলীলা দেখিয়া যখন আত্মহারা

হই, তখনও ভাবি, কি যেন নাই! বালার্ক কিরণের মধুর শোভা দেখিয়াও ভাবি কি যেন নাই, আবার মাধবীকুসুমের মধুর সৌরভেও ভাবি কি যেন নাই।

কেমন করিয়া জানিব কি নাই? যার কোন জিনিষের অভাব নাই, তার আবার কি নাই? যে সমস্ত সাধ শ্মশানের কালানলে আহুতি দিয়াছে, তার আবার কি চাই?

শান্তি? যাহার সাধের বাগান মহাশ্মশান, তাহার আবার শান্তি কি? আমি কি চাহি জানি না, আমার কিসের অভাব জানি না, হে মহাশ্মশান, তোমার দংষ্ট্রা-করাল কালানল-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি, আমি আর কি বলিব! কেবল বলি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও—

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।

বড় কে ?

অনেক দিন হইল আমার মনে এক সমস্যার উদয় হইয়াছে, অনেককে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আমার কথার সদুত্তর কোথায়ও পাই নাই, তাই আজ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—বলিতে পার, এ জগতে বড় কে ?

এই বড়-সমস্যার মীমাংসা কবে হইবে জানি না, কোথায় হইবে জানি না, কে করিবে জানি না, তোমরা যে জান বল না, এ জগতে বড় কে ?

বড়র কথা আমি যখন ভাবি, তখন আমাতে আমি থাকি না, বৃহত্তম জীব হইতে ক্ষুদ্রতম জীবের অন্তরালে যেন বিলীন হই,—সকলেরই মস্তক উন্নত, আসন উন্নত, হৃদয় উন্নত; ক্ষুদ্র কেবল আমি, নীচ কেবল আমি; ক্ষুদ্র হইয়া বড়র তারতম্য কেমন করিয়া করিব? তাই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদিগের মধ্যে কে বড় বলনা? পশু বড়, কি পক্ষী বড়, বৃক্ষ বড় কি লতা বড়, পর্ব্বত বড় কি সমুদ্র বড়, মানুষ বড়, কি দেবতা বড়, কে বড় বলনা?

পশু যেখানে থাকুক না কেন, তাহার সুখ দুঃখ লইয়া সে আছে; পরের দুঃখ দেখিয়া তাহার হৃদয়ে দুঃখ হয় না, সুখ দেখিয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয় না;—নিজের দুঃখে সে উদ্বিগ্ন হয় না,—সুখের আশেও ঘুরিয়া বেড়ায় না,—তৃণমুষ্টি পাইলে স্থির চিত্তে চর্ব্বণ করে,—তৃণের বাহুল্য দেখিলে চরণ তাড়নে মেদিনীর বেদনা জন্মায় না। সেই পশু বড় না, বড় কে? বিহঙ্গগণের

সুধা-মধুর সঙ্গীত-লহরী তাহার কর্ণযুগলের তৃপ্তি সাধন করিতেছে, কুসুম-সৌরভবাহী সমীরণ তাহার সন্তুষ্টি বিধান করিতেছে, প্রকৃতির রমণীয় চিত্র তাহার নয়ন চরিতার্থ করিতেছে, এত সৌভাগ্য কার যে, অনন্যমনে এসকল সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পারে? আমি যখন পশুর কথা ভাবি, তখন তাহাকেই বড় দেখিতে পাই, তাহার মহত্ত্ব, তাহার বড়ত্ব যেন জগৎটা জুড়িয়া থাকে; বুঝিতে পারি না, সে ছাড়া আবার বড় কে?

এস, পক্ষীর কথা একবার ভাবিয়া দেখি; পক্ষী বড় কি ছোট, মহৎ কি ক্ষুদ্র, উচ্চ কি নীচ বুঝিতে চেষ্টা করি। তাহার কথা ভাবিলে, তাহা অপেক্ষা বড় আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না। অনন্ত আকাশটা তাহার রাজত্ব; তাহার রাজ্যে সেই রাজা, সেই প্রজা, তাহার প্রভু নাই,—সেই প্রভু। তাহার রাজ্যে দাস নাই, দাসত্ব নাই। সে মনের সুখে গান গাহিতেছে, মনের সুখে উড়িতেছে বসিতেছে, দুঃখ কাহাকে

বলে তাহার রাজ্যে কেহ জানে না। তাহার অসীম ঐশ্বর্য্য ;—সুমধুর ফল তাহার আহার্য্য, নির্ম্মল জল তাহার পানীয়, সুমহৎ বৃক্ষশাখা তাহার সিংহাসন। বলত পাখীর দুঃখ কিসের? যাহার সুখের অভাব নাই, দুঃখের লেশ নাই, সে বড় না, কে বড়? সুখময়, ঐশ্বর্য্যময়, মধুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াও পাখী বড় নয়?

পক্ষী, বড় রূপবান্, বড় গুণবান্। তাহার রূপে জগৎ মুগ্ধ, গুণে জগৎ উন্মত্ত। তাহার রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! গান শুনিলে কি যেন হারান নিধি কে যেন হাতে তুলিয়া দেয়!—এমন রূপেও যে গৌরব করে না, এমন গুণেও যে আত্মহারা হয় না, সেও কি বড় নয়? পাখীরে আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার রূপ তুচ্ছ, গুণ তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, আমি এছার রূপের গৌরবে ধরাখানাকে সরা দেখি, গুণের গরিমায় জগৎকে তৃণ জ্ঞান করি; যখন নিজের ক্ষুদ্রতা ও তোমার মহত্ত্বের কথা ভাবি, তখন আমাতে আমি লুকাইয়া

যাই, তোমার মহত্ত্বে আবৃত হইয়া থাকি,—ভাবি, এ তুমিও বড় নও?

বৃক্ষের অপেক্ষা বড় যে কে, আমি ভাবিয়া পাই না, এমন নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিত, এমন সার্ব্বভৌম প্রেমের আধার, এমন বৈরাগ্যের আশ্রয়, অন্য কেহ আছে কি না আমিত জানি না। আজীবন অতিথিসেবা যাহার জীবনের ব্রত, নিজের মাথায় প্রচণ্ড তপনের দুঃসহ কিরণ ধরিয়া অন্যের সন্তাপ দূর করা যাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সে বড় কিনা, তাহাও কি বলিতে হইবে? নগরে, প্রান্তরে, উদ্যানে, কাননে, যেখানেই থাকুক না কেন, বৃক্ষ সর্ব্বত্রই অতিথি-সেবায় নিরত। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যেই কেন তাহার অতিথি হউক না—তাহার ব্যবহার সকলেরই প্রতি সমান, সকলেই তাহার নিকট নারায়ণ, সকলেই পূজার পাত্র; তাহার ফল সকলের আহার্য্য, তাহার ফুল সকলেরই পূজার সাধন। এমন বৃক্ষও বড় নয়!

লতার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিও না,—লতার কথা শুনিলে, লতার দিকে তাকাইলে,—অসীম ব্রহ্মাণ্ডটা আমার নিকট ক্ষুদ্র বোধ হয়; মনে হয়, লতার মাহাত্ম্যে যেন ব্রহ্মাণ্ডটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! বলত, আশৈশব ভগবানের উদ্দেশ্যে কুসুমাঞ্জলি লইয়া কে দাঁড়াইয়া থাকে? লতা,—সরলা বালিকাটীর ন্যায় কুসুম স্তবক হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—কখনও নিজ হস্তে ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করে, কখনও ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে অম্লানবদনে কুসুমাঞ্জলি তাহাদিগের হস্তে দান করে। এমন ভক্তির আশ্রয়, ভক্তের মানস-রঞ্জন, প্রকৃতির সাধনের ধন লতার মহত্ব আমি কেমন করিয়া বলিব? লতা না থাকিলে জগতে নিষ্কাম প্রেম কোথায় দেখিতে? বৃক্ষ লতার আশ্রয়, প্রণয়-ভাজন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, লতা বৃক্ষের চিরসহচরী। লতার বিপদে বৃক্ষের বিপৎ নাই, কিন্তু বৃক্ষ মরিলে লতা বাঁচে না;—লতা বৃক্ষকে

প্রণয়-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে,—প্রণয়ের প্রতিদান চাহে না, প্রতি-প্রণয় চাহে না, নিজে ভাল-বাসিয়াই সন্তুষ্ট। লতার ফুলে গাছের শোভা, লতার সৌরভে বৃক্ষের সৌরভ, গুন্ গুন্ করিয়া ভ্রমর লতার গুণ আজীবন গাহিয়াও শেষ করিতে পারিল না,—আমি দুই কথায় কি বলিব? এত গুণের আধার লতা বড় না ত' বড় কে?

পর্ব্বত বড় কিনা আমি বলিতে চাই না, তোমরাই বল না! যে ভগবদ্‌গত ঋষিদিগকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তাঁহাদের চরণ-ধূলিতে হৃদয় পবিত্র করিতেছে, সে বড় কিনা তোমরাই বল না। অনন্ত রত্নের আধার হইয়াও যাহার ঐশ্বর্য্য-মত্ততা নাই, অতুল সৌন্দর্য্যের আশ্রয় হইয়াও যাহার রূপগরিমা নাই, অনুপম দেহোৎকর্ষ লাভ করিয়াও যাহার গর্ব্ব-লেশ নাই, সে পর্ব্বত বড় কিনা, তোমরাই বল না! যখন ভাবি, পর্ব্বত অনন্ত আকাশে মস্তক উন্নত করিয়া নিরন্তর জগতের অভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, অভাব দূর করিবার

জন্য নিজ দেহ হইতে নদী-প্রবাহরূপ অমৃত-প্রবাহ বিতরণ করিতেছে, তখন তাহার মহত্ব আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান পায় কিনা, তা তোমরাই বল না! পর্ব্বত! যখন তোমার তুষার-ধবল উন্নত-আননে সৌরকর প্রতিফলিত হইয়া অনুপম প্রভা-জাল বিস্তার করে, তখন ভাবি, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য তোমার আননে অমৃতময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, মধুময়ী হাস্যরেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। তোমাকে দেখিলেই আমি আত্মহারা হই, তোমার মহত্বে যেন ডুবিয়া যাই! তোমার মহত্বে বিলীন থাকিয়া কেমন করিয়া বলিব, তুমি বড় নও!

সুনীল অম্বরের ন্যায় সুনীল জলরাশি অনন্ত প্রসারিত! নীলাম্বরে তারকাপুঞ্জের ন্যায়, নীল জলে শুভ্র ফেনপুঞ্জ শোভা পাইতেছে। এই ত সমুদ্র! উহার ঘোর ভৈরব নাদে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে! ভাবিতে পার, এ সমুদ্র বড় কিসে? বলিতে পার; যাহাকে দেখিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, যাহার শব্দ শুনিলে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, যাহার

বিষয় ভাবিলে শরীরের রক্ত জল হয়, সে আবার বড় কিসে? তোমার আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে সমুদ্রের মহত্ত্ব স্থান পাইবে কেন? দর্পহারী ভগবান সকলের দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন,—এই সমুদ্ররূপে ক্ষুদ্র হৃদয়ের, গর্ব্বিত হৃদয়ের, কলুষিত হৃদয়ের দর্প চূর্ণ করিতেছেন। যিনি দুরাত্মার দর্প হরণ করেন, তিনি কি বড় নহেন? অচৈতন্য তুমি যাহার ফেনপুঞ্জের অপূর্ব্ব ছটা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ, যাহার অনন্ত প্রসারিত নীলিমা দেখিয়া কম্পিত হইতেছ, যাহার ঘন ঘোর ভৈরবনাদে আত্মহারা হইতেছ, চৈতন্য দেব তাহাকে দেখিয়াই ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন! তাহার ফেনমালাকে তিনি বনমালা দেখিয়াছিলেন, নীল কান্তিকে কৃষ্ণ-কান্তি ভাবিয়াছিলেন, তরঙ্গধ্বনিকে বংশীধ্বনি জ্ঞান করিয়াছিলেন! চৈতন্য এই বনমালী, নীলকলেবর, বংশীবাদনতৎপর কৃষ্ণাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ সমুদ্র বড় নয় ত বড় কে?

আমার চক্ষে মানবও বড়। তোমরা যাহাকে

মানবের নীচতা, ভণ্ডতা, পরশ্রীকাতরতা বল, তাহা আমার নয়নগোচর হয় না; তাহাদের মহত্ত্বে আমি আচ্ছন্ন হইয়া আছি! যে জাতিতে বুদ্ধ চৈতন্য, রাম যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জাতিতে নীচতা পরশ্রীকাতরতা থাকিতে পারে, আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। যে জাতিতে নারদ মার্কণ্ডেয়, ব্যাস, গৌতম, জনক বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভণ্ডতা কৃত্রিমতা, বঞ্চনা ছলনা, সে জাতিতে প্রবেশ করিতে পারে, কিরূপে বিশ্বাস করিব? পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া অতিথিসৎকার দ্বারা কর্ণ যে মহত্ত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, নরকগত প্রাণীর উদ্ধারার্থ মহারাজ বিপশ্চিৎ যে মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, প্রাণান্তকালে ঋষিকুমার যজ্ঞদত্ত যে ঔদার্য্য প্রকটন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে নর জাতির প্রতি আমার অটল অচল ভক্তি উদিত হয়, তাহার মহত্ত্বে আমি নিমগ্ন হই। এহেন মানব বড় নয় কেমনে বলিব?

হে দেব তুমি বড় কিনা আমি জানি না। আমি তোমায় চিনি না, তোমার স্বরূপ কেমনে জানিব! তোমার স্বরূপ জানিলে আমি এত ক্ষুদ্র এত নীচ, এত হেয় থাকিব কেন? দেব, শুনিতে পাই তুমি অনন্তবীর্য্য, অমিতপরাক্রম; সুবর্ণ যেরূপ স্বকার্য্য কনককুণ্ডলাদি ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে থাকে, তুমিও সেইরূপ সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, এই জন্যই তুমি সর্ব্বস্বরূপ! আমি তোমার সর্ব্বস্বরূপের মহত্ত্ব কি বুঝিব, তোমার যে কয়টী রূপ দেখিয়াছি তাহার মাহাত্ম্যেই ডুবিয়াছি,—বুঝিয়াছি, তোমার রূপই বড়! অতএব—

> নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
> নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব
> অনন্তবীর্য্যাঽমিতবিক্রমস্ত্বং
> সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।

মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

মি কাঙ্গাল—দুট মিষ্ট কথার কাঙ্গাল। মিষ্ট কথা শুনিতে পাইলেই আমার কাণ জুড়ায়,—প্রাণ শীতল হয়,—অভাব দূর হয়। আমার হৃদয়ে একটু শূন্য আছে। অর্থে তাহা পূর্ণ হইবে না,—জ্ঞানগরিমায় তাহা ঘুচিবে না। আমি যে মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

দুর্ভাগার দুর্ভাগ্য নানা দিকে। সোণা বলিয়া ধরি, দেখিতে পাই ছাই! আমি দুঃখের কথা বলিতে যাই,—অভাব বুঝাইতে যাই,—প্রাণের যাতনা প্রকাশ করিতে যাই,—লোকে বুঝে না, বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে; আমার দুঃখ না

কমিয়া, বাড়িয়া উঠে। আমার দুঃখে কাহারও সহানুভুতি নাই, ইহা মনে করিয়া, আরও বেশী কষ্ট ভোগ করি।

আমি গরিব,—অর্থের জন্য লালায়িত নই; আমি মূর্খ--পাণ্ডিত্যলাভের অভিলাষ আমার নাই; আমি আভিজাত্য-হীন,—কৌলীন্য লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র নহি; আমি কুরূপ—সুরূপে আমার প্রয়োজন নাই; আমি হীনপদস্থ—উচ্চ-পদে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে কখনও চাই না; চাই কেবল দুট অকৃত্রিম, সরল মিষ্ট কথা। অর্থ আমার কাছে—অনর্থ; পাণ্ডিত্য—মূর্ত্তিমান দম্ভ; কৌলীন্য—পাপের বিলাসক্ষেত্র; সুরূপ—বিলাসিতার রঙ্গভূমি; উচ্চপদ—অত্যাচার, পরপীড়ন ও অধর্ম্মের লীলা স্থান! আমি এ সকল চাই না। চাই দুট মিষ্ট কথা। কবিরা বলেন চাঁদ সুধার ভাণ্ডার—আমার সুধার ভাণ্ডার মিষ্ট কথা। পৌরাণিকগণ স্বর্গ যেখানেই বলুন না কেন—আমার স্বর্গ মিষ্ট কথায়। সংস্কৃত দেব ভাষা,—আমার দেবভাষা মিষ্ট

কথা। মিষ্টকথা চাঁদের কিরণ অপেক্ষা শীতল, কুসুমের রেণু অপেক্ষা কোমল। উহা মলয়ানিল অপেক্ষা মনোহর, চন্দনরস অপেক্ষা স্নিগ্ধকর। তাই আমি মিষ্ট কথার জন্য কাঁদিয়া আকুল।

কোকিল মিষ্ট কথা জানে,—মিষ্ট কথা কয়। শুনিয়া সাধ হইল, কোকিলকে ধরিয়া হৃদয়ের এক পাশে বসাইয়া রাখি। তাহার মুখে দুট মিষ্ট কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াই,—হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করি। কোকিলকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি, —প্রাণের সখা করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিয়া রাখি। মিষ্ট কথা শুনিব বলিয়া কোকিলের কাছে গেলাম। আমায় দেখিয়া তাহার স্বর থামিল,—মিষ্ট কথা বন্ধ হইল,— সে আকাশের অনন্ত গর্ভে, কাননের অনন্ত তরুরাজিতে তাহার মধুর কথা গুলি লুকাইয়া রাখিয়া পলাইয়া গেল। মানুষেই আমাকে স্নেহ করে না, দুট মিষ্ট কথা শুনায় না; কোকিলত বনের পাখী; সে শুনাইবে কেন? চলিয়া—যাইবেইত!

মিষ্ট কথা জগতের জিনিষ নহে—মানুষের জন্য নহে। উহা স্বর্গের,—উহা দেবতার। দেবতারা প্রাণ ভরিয়া মিষ্ট কথা বলিতে পারে,—তাহারা প্রাণ ভরিয়া মিষ্ট কথা শুনিতে পায়, ঐ টুকুই দেবতার দেবত্বের সুখ। আমি মানুষ, আমি মিষ্ট কথা বলিতেও পারি না, শুনিতেও পাই না। কাজেই আমি মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

সত্যই কি মিষ্ট কথা জগতে নাই? ভিখারী হইয়া মিষ্ট কথা খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভিখারী দেখিয়া সকলেই দূর্ দূর্ করে,—তাড়াইয়া দেয়,—কত কর্কশ, কত রুক্ষ কথা প্রয়োগ করে। হরি, হরি, হরি,—আমার মলিন বসন, মলিন বদন, আকুল হৃদয় দেখিয়া কোথায় লোকের দয়া হইবে,—না, তাহারা আমায় তাড়াইয়া দেয়! কোথায় দুট মিষ্ট কথা বলিয়া আমার সন্তপ্ত, দুঃখিত, উন্মত্ত হৃদয়কে একটু সান্ত্বনা করিবে, কোথায় দুট সদুপদেশ দিয়া, দুট মধুর কথা কহিয়া আমার হতাশ হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার

করিবে,—না, আমায় মারিতে চায়,—গালি দেয়! হে দেব! মানুষের কি হৃদয় নাই, হৃদয় থাকিলে আমার অবস্থা দেখিয়া, তাহাদের অশ্রু বহিল না কেন? আমার দুঃখে তাহাদের হৃদয় গলিল না কেন?—আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার শূন্য-প্রাণ নিরীক্ষণ করিয়া, আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, প্রাণের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিল না কেন?-হায় হায়! ভিখারী দেখিয়া জগতের লোকের ক্রোধ হয়! অনাথ দেখিয়া তাহাদের বিরক্তি জন্মে! জগদীশ্বর তুমি অনর্থকর অর্থ দিয়া, লোক ভুলাইয়া রাখিয়াছ। মিষ্ট কথারূপ অমূল্য রত্নের যে অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাদিগকে দিয়াছ,—তাহার ব্যবহার শিখাও নাই কেন?—বুঝিলাম ভিখারীর কপালে মিষ্ট কথা নাই,—জগতে ভিখারী কর্কশ কথারই পাত্র।

মিষ্ট কথা শিখিব, মিষ্ট কথা শুনিব,—মনে বড়ই সাধ। পণ্ডিতের কাছে গেলাম। আমি মূর্খ। পণ্ডিত মিষ্ট কথা শিক্ষা দিয়া,—ঈশ্বরারা-

ধনার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, আমার মূর্খতা দূর করিবেন, হৃদয়ের তলে তলে এইরূপ ফল্গু নদীর মত একটা আশার স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু কপাল যে ভাঙ্গা—আশা সফল হইবে কেন?—পণ্ডিত আমার মূর্খতা লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আমার মূর্খতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিল না, চোখের জল ঝরিল না,—দুট মিষ্ট কথা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন না। মূর্খ, নির্ব্বোধ, অজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে আমাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন,—হতাশ হৃদয়টাকে আরও হতাশ সাগরে ডুবাইয়া দিলেন। আমার কাঙ্গালত্ব ঘুচিল না—মিষ্টকথা পাইলাম না।—

হতাশহৃদয়ে শূন্যমনে, বন-পোড়া হরিণের মত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। মিষ্ট কথার জন্য আমি পাগল। আমার বিশ্বাস, মিষ্ট কথাই ঈশ্বর সাধনার মূল মন্ত্র। জগদীশ্বর মিষ্ট কথার বশ। যুধিষ্ঠির মিষ্ট কথায় জগৎ মুগ্ধ করিয়া-

ছিলেন; রাম মিষ্ট কথায় শত্রুকে মিত্র করিয়াছিলেন—কৈকেয়ীকেও কাঁদাইয়া ছিলেন; যীশুখৃষ্ট মিষ্ট কথায় অর্দ্ধজগতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন; বাল্মীকি মিষ্ট কথায় দস্যুর দস্যুতা, ক্রূরের ক্রূরত্ব, নৃশংসের নৃশংসতা দূর করিয়া ছিলেন। তাই মিষ্ট কথার জন্য আমি পাগল! আমার মনে হয়, উহাতেই জগতের মধুরতা, উহাতেই সুর লোকের সুধা, উহাতেই লোক অমর হইতে পারে। কিন্তু আমার প্রাণের ধনটি কোথায় মিলিবে? কার কাছে গেলে অমৃত পান করিয়া—দুটা মিষ্ট কথা শুনিয়া—প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?

পোড়া কপাল হইলে এই রূপই হয়। বন্ধুও আমাকে দেখিয়া ভয় পায়! যাহাকে প্রাণের মত দেখিতাম, প্রাণের মত ভাবিতাম,—সেও আমাকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে, চক্ষু নিমীলিত করে, মুখ ফিরাইয়া থাকে। যাহার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, তাহার এই ব্যবহার! যাহাকে

হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন মনে করিতাম, তাহার এই আচরণ! যাহাকে মুখের অর্দ্ধগ্রাস খাওয়াইয়াছি, পরণের অর্দ্ধবাস পরাইয়াছি, যাহাকে নয়নের মণি, আনন্দের খনি ভাবিয়াছি, যাহার বিচ্ছেদে মরণ, মিলনে হাতে স্বর্গ অনুভব করিয়াছি—তাহার এই প্রতিদান! যাহাকে দেখিয়া চক্ষুর সার্থকতা বোধ করিতাম, যাহার কথা শুনিয়া কর্ণের সফলতা মনে করিতাম, সে আমাকে ঘৃণা করে। আমার প্রতি বিরক্তি-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে,—দেখিলে সরিয়া যায়; ভয়—পাছে আমি কিছু চাই। আমি আজ গরীব, নিঃস্ব, দুর্দ্দশাপন্ন। আমার শরীর জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট,—বসন মলিন, দেহ মলিন, মুখ মলিন। দেহের কমনীয় কান্তি নাই—মুখের সুকুমার লাবণ্য নাই। তাই বন্ধুও আমাকে দেখিয়া ভয় পায়! কিন্তু বন্ধো! আমি ত কিছুই চাই না—খাইতে পাইনা বলিয়া অন্ন চাই না; নিঃস্ব বলিয়া অর্থ চাই না; নিরা-শ্রয় বলিয়া আশ্রয় চাই না, চাই কেবল দুটা

মিষ্ট কথা। তুমি যদি আমায় তাহা দিতে, তবেই আমি কৃতার্থ হইতাম, স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইতাম, স্বর্গীয় সুধায় অনন্ততৃষা মিটাইতাম; অমৃত-সিঞ্চনে দগ্ধ হৃদয় শীতল করিতাম। আমার আশা মিটিল না,—জগৎ খুঁজিয়া দুটা মিষ্ট কথা যুটিল না। আমি সেই কাঙ্গাল—কথার কাঙ্গাল!

* * * *

অনেক কালের পর মায়ের কথা মনে হইল। মনে হইল, লোকে চোখ থাকিতে চোখের মর্ম্ম বুঝে না—কহিনুর হাতে পাইয়া চিনিতে পারে না। আমি আজ দুটা মিষ্ট কথার জন্য ঘরে ঘরে ফিরিতেছি, কাঁদিয়া আকুল হইতেছি। আমার চোখের জল দেখিয়া কাহারও বিরক্তি হইতেছে, কাহারও আনন্দ হইতেছে। কিন্তু যিনি আমার মুখ মলিন দেখিলে, দরবিগলিত ধারে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, "বাবা কি হয়েছে" বলিয়া সুধার ভাণ্ডার ছড়াইয়া দিতেন, তিনি আজ কোথায়? আমার চোখের এক ফোঁটা জলে যাঁহার

সমস্ত হৃদয় গলিয়া যাইত, তিনি আজ কোথায়? সেই মিষ্ট কথার ভাণ্ডার, স্নেহের উৎস, মা আমার কোথায়? যাঁহার মিষ্ট কথার তরঙ্গে ডুবিয়া, একটি কথারও মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই,—সেই মা এখন একটি মিষ্ট কথা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন কি?—মা—একবার সুধামধুর স্বরে তোমার সেই সুধামাখা মিষ্ট কথায় এ কাঙ্গালকে ডাক মা! হায়! আমি অকৃতি, পামর, পাষণ্ড। মার মিষ্ট কথা আমার মত পাষণ্ডের জন্য নহে। যখন মা মিষ্ট কথায় আমার হৃদয় প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতেন, তখন কখনও ক্রুদ্ধ হইতাম, কখনও সুধাময়ী জননীর উপর কটূক্তি করিতাম; বুঝিতাম না, আমি দেবীর অবমাননা করিতেছি,—মা মরুভূমিতে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন। যজ্ঞের চরু অপকৃষ্ট জীবের হাতে পড়িলে যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, অমৃত অসুরের হাতে পড়িলে যেরূপ লাঞ্ছিত হয়, মায়ের অমৃতপূর্ণ মধুরতা-পূর্ণ কথাগুলি আমি-পামরের

হাতে পড়িয়া ততোঽধিক লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত, অবমানিত হইল! তাই আজ আমি দুটা মিষ্ট কথার কাঙ্গাল!

কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক্ ফুলাইলাম—চোকের জলে বুক ভাসাইলাম। আত্মাকে কত তিরস্কার করিলাম,—কত ধিক্কার দিলাম! হৃদয়টা যেন একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া উঠিল! জীবনটা যেন আকাশ অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! জগৎটা যেন মহাশ্মশান হইয়া উঠিল। জগতে যেন প্রাণী নাই, প্রাণীর যেন হৃদয় নাই। লোকের কথা যেন নরকের কোলাহল,—জগতের হাসি তামাসা, আমোদ প্রমোদ যেন কালকূট হলাহল! আমার মনে হইতে লাগিল আমি মিষ্ট কথার আধার মাতার সম্মাননা করি নাই,—এখন আমার ভাগ্যে মিষ্ট কথা যুটিবে কেন?—মা যখন কাছে নাই,—অমৃতের ভাণ্ডার যখন নিকটে নাই,—অমৃত কোথায় পাইব, মিষ্ট কথা কোথায় শুনিব? মহাশ্মশানে কেবল শিবা-

কুলের ভৈরব নাদ! কোকিলের কলনাদ শ্মশানে নাই। শ্মশান-জগতে মিষ্ট কথা কোথায় পাইব! আমি কাঙ্গাল——

হঠাৎ আমার কাণে যেন কে অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিল, তাপিত প্রাণে যেন কে শীতল সুধা সেচন করিল, বলিল "কাঁদিও না"। যে হৃদয় এতদিন মরুভূমি ছিল,—হঠাৎ যেন নন্দন-কানন হইয়া উঠিল;—অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়াকাশে যেন অমৃত ভাণ্ডার চাঁদের মাধুরী ফুটিয়া উঠিল; হতাশ প্রাণটা যেন শান্তির নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিল! গভীর নিশীথের বংশীধ্বনির মত, বালক কালের মধুর লীলা, লহরীর মত, দূরস্থ সঙ্গীতের মধুর নিনাদের মত, পারিজাতপুঞ্জের সুরভি-পরিমলের মত—কি যেন কি অনুভব করিতে লাগিলাম।

কি শুনিলাম, কি অনুভব করিলাম?—কোথা হইতে আমার অশান্ত, অস্থির হৃদয়ে শান্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল? আবার শুনিলাম— "কাঁদিও না, এসো তোমার চোকের জল মুছাইয়া

দিই,—কাঁদিও না”—প্রতিধ্বনি বলিল কাঁদিও না, সমীরণ বলিল “কাঁদিও না”—কল্পনা বলিল “মিষ্ট কথা পাইলে, কাঁদিও না।” কে আমার তাপিত প্রাণ ঠাণ্ডা করিলি রে—কে আমার হৃদয়ের আগুন নিবাইলি রে—কে আমাকে জগতের নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া গোলোকধামের মধুরতার আস্বাদে মোহিত করিলি রে—সম্মুখে একটী শিশু কচি হাতের কচি আঙ্গুল দিয়া আমার চোকের জল মুছাইতেছে, আর বলিতেছে “কাঁদিও না, তোমায় যে মেরেছে, আমি তাকে মারিব।”

শিশু রে আয়—তুই আমার হৃদয়ে আয়। তুই মানুষ নহিস, তুই দেবতা। এই শ্মশানে পরের দুঃখে তোরই হৃদয় গলে, তোরই প্রাণ কাতর হয়। আমাকে জগৎ মারিয়াছে, তুই কাকে মারিবি বাছা! তুই আমার কাছে থাক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে,—জগত আমাকে আর মারিতে পারিবে না। আয়, তুই আমার হৃদয়ে আয়! তুই আমার কাছে থাকিলে এখানেই

আমার স্বর্গ। তুই যত দিন জগতে আছিস, মা যত দিন জগতে আছে, তত দিন আমার মত হতাশেরও আশা আছে। তুই মিষ্ট কথার কল্প-তরু, আয় আমার কোলে আয়, আমি মিষ্ট কথার কাঙ্গাল।

চাঁদের চালাকি।

ব লি চাঁদ, এবার যে ধরা পড়িলে! বড় চালাকি করিয়া বেড়াও! মেঘের আড়ালে আড়ালে থাকিয়া মেঘনাদের মত অসংখ্য নিরপরাধের হৃদয়ে আঘাত কর; মনে কর, তোমার চালাকি কেহ বুঝে না; কিন্তু আমি তোমায় স্পষ্ট বলিতেছি, আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না, আমি তোমার অর্থ লইয়া তোমায় বাহাদুরি দিতে পারিব না। যাঁহারা বলেন—"প্রহ্লাদনাৎ চন্দ্রঃ" তাঁহারা তোমার অর্থে মজিয়াছেন; মজিয়াছেন বলিয়াই এইরূপ বলি-

য়াছেন; আমি সেরূপ মজিতে পারিব না, বলিতেও পারিব না, স্পষ্ট কথা ভাল।

শুন চাঁদ, তোমায় একটী একটী করিয়া কয়েকটী কথা বলি। রাগ করিও না। নিজের দোষ স্বীকার করিয়া তাহা সংশোধন করিতে আমি, বলি না, ততটুকু মাহাত্ম্য তোমার নাই জানি, সংশোধন করিও, এই মাত্র আমার উপদেশ।

দেখ, তুমি আজন্ম কুটিল, প্রতিপদে কুটিল, মৃত্যু সময়েও কুটিল! যখন তোমার ভরপূর যৌবন, যখন পূর্ণিমায় পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতে উদিত হও, তখন লোকের মনে কতই আনন্দ, কতই আশা, কতই আকিঞ্চন জন্মাইয়া থাক; কিন্তু বল দেখি, কখনও কোন লোকের সাধ পূরাইয়াছ কি? যে তোমাকে সুধাকর বলিয়া ধরিয়াছে, সেই তোমাকে বিষধর বলিয়া ছাড়িয়াছে। তুমি যদি সুধাকর হও, তবে বিষধর কে, বলত বাপু!

তোমার চেহারাখানি বড়ই সুন্দর। সুন্দর বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ যে কলঙ্কে ভরা, তাহা এক-

বার ভাব কি? স্পষ্ট করিয়া বলিলে, লোকে বলিবে, কথাটা বড় শক্ত হইল; কিন্তু না বলিলেই বা চলিবে কেন? বলত বাপু, তোমার পিতার নামটী কি? কবি বলেন,—

"ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব।"

পৌরাণিক বলেন,—

"ঋক্ষেশঃ স্যাদত্রিনেত্রপ্রসূতঃ।"

তুমি সমুদ্রের ছেলেই হও, আর অত্রির ছেলেই হও, স্পষ্ট করিয়া বলিতে ক্ষতি কি?

তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তিতে কালিমা কলঙ্ক দেখিয়াও যে তোমার মুখের হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, সে নিজের মরণ ডাকিয়া আনে।

চাঁদ! সত্য বলিও, মনে পড়ে কি, সেই শরৎ-পূর্ণিমার রজনীতে দুইটী বন্ধু উদ্যানে বসিয়া কত কি মনের কথা বলিতে ছিল, আর তোমার দিকে তাকাইতেছিল। তোমায় দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল—

"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।"

তোমার আকৃতি সুন্দর, হৃদয়ও সুন্দর হইবে।

তাহারা ভাবে নাই, অমৃতে গরল আছে, কুসুমে কীট আছে, এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে। তাই তাহারা তোমাতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করিতে পারে নাই। কিন্তু চাঁদ, তুমি তাহাদের প্রাণের কথাগুলি, মরমের ভাবগুলি, হৃদয়ের আশা, ভরসা, সুখ দুঃখগুলি, তোমার কিরণে মাখিয়া তরুশ্রেণীর কিশলয় রাজিতে, মৃদুমারুতান্দোলিত সরসীর তরঙ্গ-লহরীতে, সুধা-ধবলিত গগনতলস্পর্শী রম্যহর্ম্ম্যাবলিতে ছড়াইয়া রাখিয়াছ। কেবল কি তাই! যাহাকে দেখিতে পাও, কুটিল কটাক্ষে এক এক বার ঐ দিকে ইঙ্গিত করিয়া থাক। আমাকে দেখিয়া আজ সাদা রুমালের মত সাদা মেঘখানিতে মুখ ঢাকিলে কেন? লজ্জা হইয়াছে? লজ্জা কি আছে? থাকিলে তুমি অলক্ষ্যে থাকিয়া চক্ষুর লক্ষ লক্ষ কোণাকাটা ঠারে লোকের দুঃখে টিটকারি দিতে না।

চাঁদ, তুমি না অমৃতাধার! সুধাকর!—বলত এত সুধা কোথা পাইলে? সেই যে সে দিন—সেই পূর্ণিমার রাত্রিতে গঙ্গার তরঙ্গহিল্লোলে তরণী

ভাসাইয়া, তরঙ্গলহরীতে তোমার ক্রীড়ামাধুরী দেখিতে দেখিতে, জীবনের সুখ দুঃখের গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিলাম,—ভাবিতেছিলাম, সুধাকর, তুমি সত্যই সুধা-কর; তীরসঞ্জাত কুঞ্জাবলির সুরভি কুসুমপুঞ্জে তোমার সুধা, মধুকরনিকরের মধুর গুঞ্জনে তোমার সুধা, মাধবী লতার কুসুমসম্ভার-পরিমলহারী মৃদুল পবনে তোমার সুধা; চারিদিকে তোমার সুধা কল্পনা করিয়া তরণীবক্ষে নিদ্রা গিয়াছিলাম; বন্ধুগণ আমার চারিদিকে মনের সুখে গান গাহিতেছিল। স্বরলহরী সুধাধারার ন্যায় আমার কর্ণযুগলে প্রবেশ করিতেছিল। আমি কত কি সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

মনে পড়ে কি, তারপর কি হইল, যখন নৌকা ডুবিয়া বন্ধুগণ প্রাণ হারাইলেন, শশধর বলত, তোমাকে তখন আমি কিরূপ চক্ষে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম—"বিষকুম্ভং পয়োমুখম্"। তখন হইতে বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয়ের কাল দাগটী বিষকুম্ভের ছায়া, তোমার কিরণগুলি—অমৃতে ডুবান বিষের শলা; সেই দিন তুমি আমার প্রাণে যে বিষ

চালিয়াছ, তাহার জ্বালায় আমি অস্থির আছি। এখন তুমি কবিদের কাছে যাও, আমার কাছে আর চালাকি করিতে হইবে না। তোমার সুধাকরত্বের পরিচয় আমি পাইয়াছি, যাহারা তোমার "চরণ চারণচক্রবর্ত্তী" তাহাদের কাছে যাও; আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না,—চালাকি রাখ।

চন্দ্রোদয়ে।

শারদীয়-পূর্ণিমায় প্রান্তরে বসিয়া পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব দেখিতে দেখিতে একদিন আত্মহারা হইয়াছিলাম,—ভাবিয়াছিলাম এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন আনন্দকর পদার্থ আর নাই। হৃদয়ে যদি নিরন্তর এরূপ সুধাকরের উদয় অনুভব করিতে পারি, তবেইত আমি ভাগ্যবান্। কিন্তু পারিব কি?

আজ আবার সেই চন্দ্রোদয় দেখিলাম। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সেই পূর্ব্বের আমি এখন কোথায় গিয়াছি;—এখন এক নূতন

আমি সৃষ্ট হইয়াছি। সেই শান্তিময় চন্দ্র এখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে,—এই বিষধর চন্দ্র আজি আমার মাথার উপরে বসিয়া কত কটাক্ষই না করিতেছে!

বলিতেছিলাম, আজ আবার সেই চন্দ্রোদয় দেখিলাম; পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলাম, আজিও দেখিলাম, কিন্তু কৈ, তাহার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বলতা, তাহার সেই হৃদয়োন্মাদকতা, তাহার সেই মধুর রমণীয়তা এখন কৈ? উদয়াচলের সমীপে তাহার যে রমণীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার সে মূর্ত্তি এখন কোথায়? বলি, সুধাকর একটীবার উদয়াচলের নিকটে যাইয়া আবার সেই ভাবে, সেই সরল মধুরভাবে উদিত হও, দেখিয়া আবার চক্ষু জুড়াই; এমন করিয়া মাথার উপরে বসিয়া হাসিও না, অনুতপ্ত হৃদয়ে বিষের ধারা ঢালিও না, হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত পাপরাশি প্রকাশিত করিবার জন্য তোমার কিরণকলাপ বিস্তার করিও না।

শশধর, পূর্ব্বে সরলপ্রাণে তোমার দিকে

যখনই তাকাইয়াছি, তখনই অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছি,—তখন কুটিলতা কাহাকে বলে জানিতাম না, প্রতারণা কাহাকে বলে বুঝিতাম না,—বিশ্বাসঘাতকতা কাহাকে বলে, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না। কালের কুটিলগতিতে, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, শিক্ষার প্রতিকূল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া আসিয়াছি, রুচির বিকৃত পরিবর্ত্তনে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছি! এখন আমি সমস্ত পাপের আধার! আমার পাপকুল কৌশিককুলের ন্যায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়টী আশ্রয় করিয়া নিরাপদে অবস্থান করিতেছে, সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, পাছে তাহাদের শান্তি নিকেতনে তোমার কিরণ প্রবেশ করে, এই আমার ভয়!

শশলাঞ্ছন! একবার নিজের কথা ভাবিয়া দেখ। আমার হৃদয়ের অন্ধকার দেখিয়া কটাক্ষ করিবার পুর্ব্বে নিজের তমিস্রা-প্রিয়তার কথা মনে কর,—দুইটী পক্ষের কথা একবার ভাব। শুক্ল

পক্ষেও প্রতিদিন তুমি পূর্ণ নও, কৃষ্ণ পক্ষেও তুমি প্রতিদিন অদৃশ্য নও। শুক্লে আকাশবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চারিদিকে কর প্রসারণ করিয়া পরিশেষে তামসী নিশার অন্তরালে বিলীন হও না কি? কৃষ্ণে তামসী রজনীর সুনীল নিচোলান্তরিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে আবরণ মুক্ত করিয়া প্রকাশিত হও না কি? তুমি এত করিয়াও আপনাকে নিষ্কলঙ্ক মনে কর। তোমার করস্পর্শে সীমন্তিনী-কুল সুধামাধুরী অনুভব করে, তাই তুমি সুধাকর। আমি কিন্তু ভাবি, তুমি আমার পক্ষে—দুই পক্ষেই দোষাকর!

শশধর, তোমার দোষে আমি মর্ম্মাহত,—তোমার কলঙ্কে আমি কলঙ্কিত, তোমার অত্যাচারে আমি উৎপীড়িত,—তোমার পাপাচারে উৎকণ্ঠিত! মনে করি, আমি যোগে যাগে পরমার্থ সাধনে তৎপর হইব, সাধনাবলে পাপ-তাপক্লিষ্টমানসে শান্তির স্রোতস্বিনী বহাইব,—সংসারের পাপ চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া, পরম পুরুষের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ

করিব,—বঞ্চনায়, প্রতারণায়,—আর বলিতে পারি না, আরও কত কি অকথ্য অশ্রাব্য পাপপঙ্কে আত্মাকে লিপ্ত করিয়াছি,—তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিব, কিন্তু শশাঙ্ক,—তুমি—তুমি আমার সাধনের অন্তরায়!

আমি যখনই মনে করি, বৈরাগ্য অবলম্বন করিব, তখনই তুমি আমার হৃদয়াকাশে উদিত হও,—তোমার সৌম্য মূর্ত্তিতে তখনই আমি কত বিলাসের ছায়া দেখিতে পাই, কত লীলার লহরী দেখিতে পাই, কত প্রেমের তরঙ্গ দেখিতে পাই।—কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাই, কত বিরহাতুরা সীমন্তিনী বাতায়নাবলম্বিনী হইয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তোমাকে যেন আহ্বান করিয়া প্রাণের জ্বালা নিবাইতে চাহিতেছে, তোমার শীতল করস্পর্শে তাহাদের হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিতে চাহিতেছে, যেন তোমার স্পর্শে আত্মাকে চরিতার্থ করিবে বলিয়া তোমার উপাসনা করিতেছে। মনে করি বৈরাগ্য অবলম্বন করিব, তখনই অতীত স্মৃতি তোমাকে

চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে,—আমার গৃহে তোমার অপূর্ব্ব যোগ দেখিতে পাই;—ইহাতে যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়, আমরা কোন্ ছার!

ওহে কুমুদিনীরঞ্জন, তোমার করস্পর্শে কুমুদিনী-কুল প্রমুদিত হইতে পারে,—তোমার স্বরূপ দেখিয়া তাহারা সুখানুভব করিতে পারে,—কিন্তু আমি পারি না। তোমার রূপে আমার মনে নানারূপ বিরূপ ভাবের উদয় হয়। লোকে তোমাকে শীতরশ্মি বলে, তুমি আমার পক্ষে চণ্ডরশ্মি অপেক্ষাও প্রচণ্ড,—তোমার কিরণ আমার পক্ষে অগ্নিকণা অপেক্ষা সন্তাপকর! তোমার নামে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে! দ্বিজরাজ, তুমি উদয়াচলের জঙ্গল হইতে আসিয়া যৌবন-সৌরভে গৌরব করিয়া সৌম্য-কামিনীদিগের মনোমোহন করিয়া বেড়াইতেছ, আর আমার দিকে তাকাইয়া ভ্রূকুটী করিতেছ,—এ দুঃখ কোথায় রাখি বল দেখি?—

নিশানাথ, তুমি আমাকে কি ভাবিতেছ জানি না;—নির্ম্মল নীল গগনে তোমার রজত ধবল

কিরণকলাপের সুধাময়ী প্রভা দেখিয়া বিলাপকারী পেচককুলধুরন্ধর মনে করিয়া হাসিতেছে কি না তা' তুমিই জান; তোমার মৃদু মধুর জ্যোতিতে বিনাশোন্মুখ ক্রমবিশীর্য্যমাণ ধ্বান্তরাশি ভাবিতেছ কি না, তাহাও তুমিই বলিতে পার;—তবে এ টুকু নিশ্চয় যে,—তুমি ভাবিতেছ—ভাবিতেছ,—(উঃ —কিরূপে জানিলে!

ওহে দ্বিজরাজ,—তোমার চরণে আমার একটী নিবেদন আছে, শুনিবে কি;—তুমি আমাকে যাহাই মনে ক'র না কেন,—আকাশের মধ্যে থাকিয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে আমার প্রতি এমন করিয়া কটাক্ষ করিও না,—"জ্ঞানে মৌনম্" নীতিটীর পক্ষপাতী হও। প্রতিপদে তোমার কলা মাত্র দেখিয়াছি তাহাতেও হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মর্ম্মাহত হই নাই। আজ পূর্ণিমায় তোমার পূর্ণ-কলা দেখিয়া,—তোমার নয়ন হিল্লোলে বিলাসলহরী দেখিয়া, তোমার হৃদয়-বিমর্দ্দী কটাক্ষ-বিক্ষেপ দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি।—শশধর জান না কি,—

"দুঃখ পেয়ে চণ্ডালে শাপে,
খণ্ডিতে নারে ব্রহ্মার বাপে।"

তুমি অনেক জ্বালাইয়াছ, অসহ্য যাতনায় তুমি আমাকে দগ্ধ করিয়াছ,—তাই তোমায় অভিসম্পাত দিতেছি তুমি শিখণ্ডীর শিখণ্ডে চন্দ্রকরূপে অবতীর্ণ হও—অথবা শিখণ্ডী হও।

এত হাসি কেন?

কতদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়াছি আজ মনের জ্বালা জুড়াইব,—প্রাণের যাতনা ভুলিয়া যাইব; কতবার মনে সাধ হইয়াছে, শৈশবসহচরের বিয়োগ দুঃখ, অকৃতজ্ঞ বন্ধুর ছল চাতুরী, নিজের চপলতা প্রসূত পাপ-কাহিনী বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুকাইয়া রাখিব; সাধ হইয়াছে, কিন্তু সাধ মিটাইতে পারি নাই। যখন চেষ্টা করিয়াছি,—তখনই বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন—প্রকৃতির বিকট হাস্যের তুমুল ঘটায় আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে—কতবার

হতাশ প্রাণে বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে, প্রকৃতির দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছি,—এত হাসি কেন?

নীরব, নিস্তব্ধ নিশীথে গভীর অন্ধকার দেখিয়া কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ অন্ধকার আমার হৃদয়ে বিরাজ করিলে আমি কতই সুখী হইতাম! যদি আমার হৃদয়ের অতীত সুখের উন্মাদিনী ছায়া গাঢ় অন্ধকারে আবৃত থাকিত, যদি ভবিষ্য নরকের বিভীষিকাময়ী করাল মূর্ত্তি তমসাচ্ছন্ন হইত, যদি প্রণয়িনীর গরলাধার প্রেম মূর্ত্তি এই অন্ধকারে অন্তর্লীন হইত, তবে, আমি কতই সুখী হইতাম! তবে, প্রকৃতির এই দারুণ ছবি, অমানিশার ঘোর অন্ধকার, আমার নয়নে কতই মধুরমোহন মূর্ত্তিতে, স্নিগ্ধ শ্যামল মূর্ত্তিতে, কোমল কমনীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইত, মানব-হৃদয় তাহা কল্পনা করিতে পারে কি?

নিবিড় অন্ধকারে ভূতল আছন্ন দেখিয়া, নিবিড় মেঘ জালে গগন-মণ্ডল সমাবৃত দেখিয়া, পাতালোদরগত নিবিড় ধ্বান্তের কল্পনা করিয়া,

অন্ধকারকে কতবার যে হৃদয়ে আহ্বান করিয়াছি, —কতবার যে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছি, কতবার যে তাহার অসীম প্রতাপের কথা কত রূপে ভাবিয়াছি তাহা আর কি বলিব। ভাবিয়াছি অন্ধকার, তুমি আমার আশ্রয়; শান্তির নিকেতন! আমার হৃদয়ের পাপের মলিন মূর্ত্তি তোমার কাল অঙ্গে মিশাইয়া রাখ,—তাহা হইলেই আমার নয়নের নিকটে তাহা আর ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না। হঠাৎ চপলা চমকিল; গভীর গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কম্পিত হইল, প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল! প্রকৃতির অট্টহাসির ঘোর ঘটা দেখিয়া, তাহার হাস্য প্রভার বিদ্যুচ্ছটা দেখিয়া প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল, হৃদয়টা শূন্য বোধ হইতে লাগিল—শূন্য হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলাম, এত হাসি কেন?

দেখিতে দেখিতে মেঘমালা কোথায় চলিয়া গেল, সুধাকর রজত ধবল কিরণ কলাপ বিস্তার করিয়া আকাশ পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকরসংযোগে কালিন্দীবক্ষে তরঙ্গাবলীর ন্যায়

আমার হৃদয়যমুনায় অভূতপূর্ব্ব চিন্তা তরঙ্গের আবির্ভাব হইল। কালিন্দীর বক্ষ জলে কাল, আমার হৃদয় পাপে কাল; কালিন্দীর হৃদয়ে জল-তরঙ্গ, আমার হৃদয়ে কলুষ-তরঙ্গ; প্রভেদ এই যে কালিন্দীর জল-কল্লোল-কোলাহলে শ্রোতার শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত হয়, আমার হৃদয়ের পাপ-কল্লোল-কোলাহলে আমার শ্রবণ-যুগল পরিতপ্ত হয়,—কর্ণ-কুহরে কি যেন কি এক বিষস্রোত প্রবাহিত হয়,—আমার প্রাণটা যেন আত্মহারা হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া, কোথায় চলিয়া যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের ন্যায় চারিদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অধীর হইয়া পড়ে। লতিকাকুলের কিশলয়াধরে জ্যোৎস্না হাসি দেখিয়া,—উন্মত্ত হৃদয় ভাবে, এত হাসি কেন? সৌধাবলীর স্ফটিকস্তম্ভে চন্দ্র প্রতি-বিম্বের রূপপ্রভা দেখিয়া ভাবে,—এত হাসি কেন? কুমুদিনী-কপোলে আনন্দের মধুর আভা দেখিয়া ভাবে,—এত হাসি কেন?

বসন্তকালে উদ্যান ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—

সেখানেও এই জ্বালা--হাসির জ্বালা! উদ্যানের কুসুমকুল আমায় দেখিয়া হাসে,—ভ্রমরবৃন্দ গুন্ গুন্ করিয়া তাহাদের কাণে কাণে কি বলিয়া যায়, আর তাহারা নির্নিমেষলোচনে, আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে। আমার হৃদয়ের মলিন আকৃতি তাহারা দেখিতে পায় কি? আমার কুৎসিত কার্য্যাবলীর সংবাদ ভ্রমর কোথা হইতে সংগ্রহ করিল? মানুষে যাহা জানে না, সে পাপের কাহিনী, সে তাপের কথা তাহার কাছে কে বলিল? পাপের ছবি কি হাসির বিষয়? যাহার হৃদয় বিষে দগ্ধ হয়, সে কি হাসির পাত্র? আমি রূপ-সৌরভ-বিমুগ্ধ হইয়া ফুলের হার গলায় পরিয়াছিলাম—অন্তর্লীন ভুজঙ্গ আমার হৃদয়ে দংশন করিয়াছে, সেই বিষের নীল রেখা কি হাসির বিষয়? সরোবরে কমল তুলিতে যাইয়া কণ্টকে আমি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, সেই ক্ষত-বিশ্রুত শোণিত-ধারা কি হাসির বিষয়? দুঃখীর দুঃখ দেখিলে, দয়ার্দ্র হৃদয় গলিয়া যায়,—আজ তাহার বিপরীত

দেখি কেন? আমার দুঃখে যে প্রকৃতি-সুন্দরী এক সময় শিশিরাশ্রু বর্ষণ করিয়া সমানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার মুখচন্দ্রে আজ এত হাসি কেন?

বিধাতার এ বিশ্ব এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! হর্ষ-বিষাদের এরূপ অপূর্ব্ব সমাগম আর কোথাও আছে কি না, কে বলিবে? একদিকে পাপীর অনুতাপক্লিষ্ট হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে,—অন্য-দিকে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়-রাজ্যে আনন্দ-প্রবাহ বহিতেছে,—স্থানে স্থানে দুইয়ের অপূর্ব্ব সমাগম দেখিতে পাই—কিন্তু আনন্দ-তরঙ্গিণী ত দাবানলের জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে পারে না! যেদিকে নিরীক্ষণ করি, আমার হৃদয়ের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাই,—চন্দ্রের বিষদগ্ধ হাসি দেখিয়া অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আশ্রয় লইয়াছি; সেখানেও হাসি, তারকাকুল আমায় দেখিয়া হাসিয়াই আকুল! একি বল দেখি? অই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—এত হাসি কেন?

শুক্লে—গগনে চাঁদ হাসে, কৃষ্ণে—তারা হাসে, গ্রীষ্মে—নানা ফলে পাদপ হাসে; বর্ষায়—বিদ্যু-চ্ছটায় মেঘ হাসে; শীতে চূত মুকুলে মধুকরের বা কলকণ্ঠের হাসির ঘটা কত! বসন্তে—দারুণ বসন্তে, কিসলয়ের হাসি, কুসুমের হাসি, চাঁদের হাসি, প্রণয়ি-প্রণয়িনীর বিকট হাসি! তাই বিষাদ-বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া অনুক্ষণ ভাবিতেছি,—এত হাসি কেন? আমার দিকে তাকাইয়া ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া এত হাসি কেন?

মেঘ।

আকাশের উপরে মেঘগুলি যখন ভাসিয়া বেড়ায় তখন তাহার দিকে কখনও তাকাইয়াছ কি? তাকাইয়া থাকিলে কি ভাবিয়াছ বল দেখি? সন্ধ্যা সময়ে তটিনীর তীরে বা তরণীর উপরে বসিয়া নানা রঙ্গের মেঘের খেলা দেখিয়া কি ভাবিয়াছ বলিতে পার কি? আকাশে মেঘের খেলা দেখিয়া, হৃদয়ে ভাবের কত লহরী-লীলা দেখিয়াছি, কত তরঙ্গাঘাত সহিয়াছি, কত অস্ফুট, অনির্ব্বচনীয়, মাধুরী অনুভব করিয়াছি, তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তাই তোমায় সুধাই, তুমি বলিতে পার কি?

আমার কথাগুলি শুনিয়া যদি কেহ হাসে হাসুক, সে ভাবরাজ্যের অধিবাসী নহে, ভাবের কথায় কথা কহিবার তাহার অধিকার নাই। যিনি বিজ্ঞানের প্রখর জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন, মেঘের জলময় নির্জীব দেহের সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছেন,— তাঁহাকেও আমি ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করি না, —অরসিকে রহস্য নিবেদন করিতে চাহি না; যদি আমার মত কেহ থাক, মেঘের রূপেগুণে বিমোহিত, আত্মহারা, মাতোয়ারা কেহ থাক, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, কালিদাসের যক্ষের ন্যায় আকাশচারী জলধরকে হৃদয়বিহারী সহচর মনে করিয়া থাক,— তবে, এস, আমার কথার উত্তর দাও,—তুমি পারিবে, আমার ভাবলহরী কোথায় শেষ হইয়াছে, আমার সুখের স্বপ্ন কোথায় ভাঙ্গিয়াছে, আমার সাধের হার কোথায় ছিঁড়িয়াছে, তুমি বলিতে পারিবে।

একদিন, সন্ধ্যা-সময়ে তরণী আরোহণে তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া যাইতেছিলাম,

পশ্চিমাকাশে জলধরপটল দিনান্তসূর্য্য-কিরণে সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল! তখন গৈরিক-সমাচ্ছন্ন অরুণ-রাগ-রঞ্জিত হিমাচলের ন্যায়, কাঞ্চন-কান্তি-কমনীয় সুমেরুর ন্যায়, সুশোভন-কান্ত-মূর্ত্তি কুঙ্কুম-শৈলের ন্যায়,—আরও কত যে কিসের ন্যায় মেঘ-শৈল আমার নিকট প্রতি-ভাত হইতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। আবার মাঝে মাঝে শ্যাম শ্বেত হরিতাদি নানাবর্ণ মেঘ-খণ্ডের সমাবেশ দেখিয়া কতই না কল্পনা করিতে-ছিলাম? ভাবিতেছিলাম এ বুঝি পরীর রাজ্য, কুঙ্কুমের পর্ব্বতে বুঝি পরীর প্রাসাদ নানা রঙ্গে বিরাজ করিতেছে; ভাবিতেছিলাম এ বুঝি দেবতার উপবন,—ঐগুলি বুঝি তাহাদের আরামকুঞ্জ; ভাবিতেছিলাম কুসুমাবরণে সমাবৃত হইয়া কুঞ্জগুলি বিবিধ শোভা ধারণ করিয়াছে;—ভাবিতেছিলাম, এই বুঝি সেই নন্দন কানন,—ইন্দ্রের উদ্যান, উর্ব্বশী মেনকার লীলাস্থান; ভাবিতেছিলাম এবুঝি—

বল গো? আমার মনে আর কি ভাবের

উদয় হইয়াছিল বল না গো! আরও কত যে অস্ফুট ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা বলিতে পারিতেছি না, স্মরণ করিতে পারিতেছি না,—তাই হৃদয়টা ব্যাকুল হইয়াছে, পার যদি আমার মনের কল্পনাগুলি তোমরা বল গো!

দেখিতে দেখিতে মেঘের আকার-পরিবর্ত্তন হইল; সহসা কুঙ্কুম-শৈল অন্তর্হিত হইল; সুনীল আকাশ-সাগরে মেঘ তরঙ্গলীলা বিস্তার করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-সাগরেও ভাবের তরঙ্গ-ভঙ্গী দেখা দিল;—মনে হইল,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

যাহাকে অটল অচলশ্রেণী ভাবিতেছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে চঞ্চল তরঙ্গমালা হইল; স্বপ্নের সুখ-সমৃদ্ধির ন্যায় আমার নন্দন-কানন আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

পৃথিবীও এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণপরিবর্ত্তনীয় মেঘের রাজ্য নয় কি? আশৈশব যত জিনিষ

যতরূপে দেখিয়াছি, এখন ঠিক তাহা সেইরূপে দেখিতে পাই কি? কোন্ কালেই বা কে পাইয়াছে? দশরথ যে কৈকেয়ীকে স্নেহময়ী, প্রেম-ময়ী, মাধুর্য্যময়ী দেখিয়াছিলেন, পরিণামে তিনি সেই স্নেহ প্রেম ও মাধুর্য্যের আধারকে গরলের আধার মনে করিয়াছিলেন; তাঁহার কল্পনাময় সুখের শৈল, বিষাদময় শোকের সাগরে পরিণত হইয়াছিল।

একদিন নির্ম্মল নীল গগনে অগণ্য নক্ষত্র শোভা পাইতেছিল। তখন আমার কত কি মনে হইতেছিল তাহা কে বলিবে? যে সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে পারে, সে আমার ভাবের তরঙ্গ গণিতে পারিবে। সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গাবলি যেমন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর আকারে পরিণত হইয়া ক্রমে নেত্র-পথের অতীত হয়, আমার ভাবের তরঙ্গও ক্রমে পরিস্ফুটতা পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাব ধারণ করিতেছিল। ভাবিতেছিলাম,—আকাশ একটী অনন্ত বিস্তৃত উদ্যান—পুণ্যাত্মাদের

আরাম স্থান, দেবতাদের সাধের বাগান; ভাবিতে-ছিলাম, বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, নিজের ভাবে যেন ফুলগুলি হাসিতেছে, মধুর সৌরভে রূপের গৌরবে যেন ঢলিয়া পড়িতেছে। ভাবিতেছিলাম, এই উদ্যানে একবার বেড়াইয়া আসিলে হয় না, কতকগুলি ফুল তুলিয়া যাঁহাকে ভক্তি করি, যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে স্নেহ করি, তাহা-দিগকে উপহার দিলে হয় না? ভাবিতে-ছিলাম......

সহসা কাল মেঘ আকাশে দেখা দিল, দেখিতে দেখিতে ফুলের বাগান নিবিড় জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইল,—নীল নীরধরের গভীর গর্জ্জনে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, আমার ভাবের স্রোতে প্রতিকূলবাতে উত্তাল তরঙ্গ উপস্থিত হইল। ভাবিতেছিলাম,—কেন এমন হইল, সুখের কল্পনায় জলধর কেন প্রতিকূল হইল? সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া জলধরের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইল? ভাবিলাম, আমি মানুষ, দেবতার বস্তুতে লোভ করিবার কে? দেবতার

সাধের বাগানের ফুল তুলিবার কে? তাই আমার শাসনের জন্য দেবরাজ জলধরকে পাঠাইয়াছেন, তাই আজ তাহার এই ভীষণ মূর্ত্তি, ভীষণ স্বর! ভাবিলাম—পরের আদরের বস্তুতে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যে মহাপাপ, মেঘ আজ আমায় সে শিক্ষা দিল! পাপীর শাসনের জন্য জলধর সৌম্য মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া এই করাল মূর্ত্তি ধরিয়াছে, —বিদ্যুজ্জিহ্বা বিস্তার করিয়া পাপীর প্রাণে দারুণ আতঙ্ক জন্মাইতেছে। আর কি ভাবিয়াছিলাম বলিতে পারি না, অর্দ্ধবিস্মৃত স্বপ্নকাহিনীবৎ হৃদয়ের অন্তরালে অন্তরালে কি যেন ভাবনার কথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিতে পারিতেছি না, তাই বলি,—বল না, মেঘ দেখিয়া তোমাদের মনে কি ভাব হয়, বল না?

একদিন নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রাণের যাতনা, মরমের বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আকাশ সুশ্যামল জলধরপটলে সমাবৃত হইয়া স্নিগ্ধমূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছিল। কর্পূরধবল বলাকার শ্রেণী মেঘের বুকে মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। জলধরের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি আমার তাপিত প্রাণে অমৃতধারা ঢালিতেছিল, ভাবিতেছিলাম—মেঘ রে "তুহুঁ মেরা শ্যাম সমান," তোর বলাকাপঙ্‌ক্তি আমার শ্যামের বনমালা, তোর ইন্দ্রধনু আমার শ্যামের মোহন চূড়া,—"তুহুঁ মেরা শ্যাম সমান।" শ্যাম, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে, তুমি কর না কেন? আমি যে পদে পদে বঞ্চিত হইতেছি, প্রতারিত হইতেছি, তাহার প্রতিকার কর না কেন? বিশ্বাসঘাতকের দৌরাত্ম্যে আমার হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি বিশ্বাসঘাতকের মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ কর না কেন?

ভাবিতেছিলাম,—সংসারে মেঘের কোলের বলাকাপঙ্‌ক্তি বড়ই সুখী; সংসারের পাপ তাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভাবিতেছিলাম—মেঘ-রাজ্যে যাইতে পারিলে কতই সুখী

হইতাম, নির্লিপ্ত হইয়া, জগতের সুখে দুঃখে লক্ষ্য না করিয়া, আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, ভাবিতেছিলাম……

কি ভাবিতেছিলাম কেমন করিয়া বলিব— কি না ভাবিয়াছিলাম তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব। মেঘ দেখিলে আমাতে আমি থাকি না,— মেঘ আমার তাপিত প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করে, হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে, কুপথপ্রবৃত্ত মনকে সৎপথে ধাবিত করে,—কেমন করিয়া বলিব মেঘ দেখিয়া আমি কি ভাবি? তাই বলি, তোমরা মেঘ দেখিয়া কি ভাব, একবার বলত।

বউ কথা কও।

পুরাকালে বসন্তের অন্তে, পাখীটা আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিত "বউ কথা কও।" সেই সে কালে যেরূপ ডাকিত, আজিও সেইরূপ ডাকিতেছে— "বউ কথা কও"—তুমি বাপু বনের পাখী, তোমার এত ইয়ারকি কেন? "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" বলিয়া লোকের কাণ ঝালা পালা কর কেন? স্পষ্ট কথা ভাল, তুমি আর যেখানে ইচ্ছা ডাকিও, আমাদের ওপাড়ায় ডাকিও না।

তুমি নিতান্ত মূর্খ, সভ্যতার লেশমাত্রও তোমাতে

নাই। আজ ঊনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দীরই বা আর বাকি কত? এখনও কি তুমি মনে কর, বউ সাত হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখে, কথা কয় না! তুমি কথা কহিতে শিখাইবে, আর তাহারা কথা কহিবে! ধিক তোমারে পাখী! ইচ্ছা হয়, কোন কথা না বলিয়া, ওপাড়ায় একবার বেড়াইয়া এসনা কেন, দেখিবে বউ কথা কয় কি না?

তুমি বুঝি মনে কর, আজিও বউ অসূর্য্য-স্পশ্যা! এই জ্ঞানালোকের ছড়াছড়ির দিনেও তাহারা "অলোকস্পশ্যা" নহে! আজিও ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকাইয়া ঘরের কোণে মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকে! একটু বাহিরে যাওয়া, বাগানে হাওয়া খাওয়া, দুটো আমোদ প্রমোদ করা, তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে না! মুর্খ পাখী, তাই তুমি "বউ কথা কও" বলিয়া গলা ফাটাইতেছ! তোমাদের যদি জানা থাকিত, তাহাদের পঞ্চম স্বরে কোকিল দেশ ছাড়ে, তাহাদের বেণীর অপূর্ব্ব কালিমায় চাঁদের হৃদয়ে কলঙ্ক বাড়ে, তাহাদের উদ্যান

সঞ্চারে দূর্ব্বাদল কতবার পোড়ে, তাহা হইলে, চেঁচাইয়া তুমি কখনই গলা ভাঙ্গিতে না; হইলেই বা পাখী, তুমিই বা এতটা বাজে খরচ করিবে কেন?

তোমায় কয়েকটা কথা বলিব, তুমি মনে করিও না, আমরা সব বোকা, কিছুই বুঝি না, সুতরাং তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না! তুমি যখন আকাশ ফাটাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠ "বউ কথা কও," তখন আমাদের মনে কত কথা হয়, তাহা তুমিই জান না, আমাদিগকে ঠকাইবে কি? তোমার অস্ফুট "বউ কথা কও" কত লোকের অন্তঃকরণে পরিস্ফুটভাবে, কত কথা জাগাইয়া দেয়, তাহা তুমি বুঝিবে কি? তোমার কথা যে কত ভাবে পূর্ণ, কত রসে পূর্ণ, কত শ্লেষে পূর্ণ, তাহা বনের পাখী তুমি, তুমি কিরূপে বুঝিবে?

তোমাকে একটী একটী করিয়া কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলত পাখী, কাহারও বউ কথা কউক, বা না কউক, তাহাতে তোমার মাথা ব্যথা

কেন? তুমি চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গ কেন? প্রয়োজন না থাকিলে, স্বার্থ না থাকিলে, অতি গণ্ডমূর্খও কোন কথা বলিতে চায় না, বলিতে যায় না; তবে, তুমি কোন্ প্রয়োজনে বলিয়া থাক "বউ কথা কও!" আর, সব কথারই সময় অসময় আছে, তোমার কিন্তু তাহা নাই"; প্রত্যূষে আকাশে ছড়াইয়া থাক "বউ কথা কও," মধ্যাহ্নে তরুর শাখায় বসিয়া চেঁচাইয়া বল, "বউ কথা কও"; সায়ংকালেও উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠ "বউ কথা কও";—নিশীথে কত লোকের যে সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া থাক, কত লোকের হৃদয়ে অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতি জাগাইয়া থাক, কত লোকের যে প্রাণের অন্তরালে অন্তরালে সংশয়ের বিষতরঙ্গিণী, অশান্তির দারুণ প্রস্রবণ বহাইয়া থাক,—তাহাও কি বলিতে হইবে?

তোমার মুখে "বউ কথা কও" শুনিয়া কত লোকের প্রাণের ভিতর যে তুমুল ঝটিকা বহিয়া যায়, তাহার কোন অনুসন্ধান, বোধ হয় তুমি

রাখ না; তুমি চিরকালই বলিয়া আসিতেছ "বউ কথা কও", তাহারা কিন্তু অন্য কথা ভাবে, অন্য কথা শুনে, তোমার স্বরে তাহাদের কাহারও কাণে অমৃত ক্ষরে, কাহারও প্রাণের শান্তি হরে; তাই তোমায় বলি, তুমি এমন করিয়া যখন তখন বলিও না "বউ কথা কও"।

তুমি বনের পাখী, মানুষের কথায় কাজ কি? অনন্ত আকাশ তোমার বিহার স্থান, অনন্ত পৃথিবী তোমার বিচরণ স্থান, অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে যাইয়া তোমার প্রাণের সাধ মিটাইয়া বল না কেন "বউ কথা কও"? আকাশের উচ্চতম প্রদেশে উঠিয়া মানবশ্রুতির অগোচরে বলনা কেন "বউ কথা কও",—তুমি পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া কুল-ললনার দিকে তাকাইয়া মদমত্ত কণ্ঠে বলিয়া বেড়াও "বউ কথা কও", এইটাই যে তোমার রোগ! তাইতেই না সন্দিগ্ধ হৃদয় আকুল হয়!

আচ্ছা, পাখী, তোমার বলিবার কি আর কথা নাই? টিয়া, তোতা, ময়না যে "রাধা

কৃষ্ণ” বলিয়া লোকের নিকট কত আদর অভ্যর্থনা লাভ করে, তাহা কি জাননা? তুমি “রাধা কৃষ্ণ” বলিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতে পার না,—লোকের শ্রবণ-বিবরে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে পার না? এমন কৃষ্ণ নাম ছাড়িয়া রাত দিন অবিশ্রামে বলিতেছ “বউ কথা কও”—এ তোমার কিরূপ প্রবৃত্তি! পরের মনে কষ্ট দিয়া আত্মার যে কি তৃপ্তি হয়, তা তুমিই জান, আর তোমার এ নীচ প্রবৃত্তিকে যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহারাই জানে। আমরা বুঝি না।

বসন্তের অন্তে, তোমার “বউ কথা কও” যে কিরূপ বিষদিগ্ধ শলাকার ন্যায় কত লোকের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহা সত্যই তুমি জান কি? বাসন্তী লতার অচিরোদ্গত পল্লবরাজিতে, উদ্যানের প্রতি তরুর অচিরবিকশিত কুসুমপুঞ্জে, নিশীথিনীর নক্ষত্রনিকরের উজ্জ্বল প্রভায়, জাহ্নবীর শীকরবাহী মলয়ানিলে তোমার কথাগুলির প্রত্যেকটী বর্ণ তাহারা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়। তোমার

জ্বালায় লোকে পলাইতে চায়, কিন্তু কোথায় পলাইবে? সর্ব্বত্রই অগ্নিশিখা! যে দিকে যায়, সেইদিকেই যে "বউ কথা কও"!

তোমার কথা শুনিয়া অন্যের মনে কি হয়, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি অম্লানবদনে বলিব সকলেরই কষ্ট হয়। কেহ নিজে দুঃখে দগ্ধ হয়, কেহ অন্যের দাহ দেখিয়া দগ্ধ হয়। যাহার "বউ কথা কয়" সে যেমন তোমার উপর বিরক্ত, যাহার বউ কথা না কয় সেও তোমার উপর তেমনি বিরক্ত। যে কথা কয় তাহাকে বলা কেন, "কথা কও"? আর, যে না কয়, তাহাকেই বা বলা কেন,—"কথা কও"? এ অবস্থায়, ঈদৃশ স্থানে থাকিয়া, ঈদৃশ ভাবে কটাক্ষ করিয়া, ঈদৃশ ভাষায় যদি ঈদৃশ পক্ষী বলিয়া বেড়ায়,—"বউ কথা কও" তাহা হইলে "পরমহংসের" প্রতি রাগ হয়, তা' তুমিত একটা সামান্য পাখী! তাই অনুনয় করিয়া বলি, তুমি কয়টা দিন থাম, —এমন করিয়া আর বলিও না,—"বউ কথা কও"।

কর্ণ।

এ কর্ণ মহাভারতের নহে, ভূভারতের;—ইহার অপর নাম "কাণ"। আজ আমরা এই কর্ণ বা কাণের কথা বলিব। কাণের দুঃখ কাহিনী পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে নিবেদন করিব। কাণ-কাহিনী পাঠকগণের হৃদয়ে বিষাদের ছায়ার আবির্ভাব করিতে পারিলে, কাণের প্রতি লোকের একটু সহানুভূতি জন্মিলে আমরা সুখী হইব।

কর্ণ লেখকের নিকট আত্মদুঃখ বিবৃত করিয়া

একখানি দরখাস্ত করিয়াছে, তাহার দরখাস্ত কোন ক্রমেই অসার নহে,—বরং অতিশয় সারগর্ভ। দরখাস্তের কয়েকটী কথা আমরা দিতে চেষ্টা করিলাম, ইহাতে যদি মহোদয়গণ কর্ণের দুর্দ্দশা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সাহায্য-বিধানে যত্নপর হন, তবেই আমরা শ্রম সফল বোধ করিব। কর্ণের কথা এই—

"আমি কি আপনাদের নিকট বিচার পাইব না? আমার প্রতি অবিচার আর কত কাল হইবে, "কত কাল পরে, বল লেখক রে, দুখ-সাগর সাঁতারে পার হব?"

"চিরটা কাল কাঁহাতক কষ্ট সহ্য করি বলুন? আত্মরক্ষা করিবার জন্য কত লোকের আশ্রয় লইলাম, কিন্তু কষ্টত দূর হইল না। যাঁহারা জগতের আধি ব্যাধি নিবারণ করেন তাঁহারাও আমার দুঃখের কারণ হইয়া উঠেন। জীবনের সমস্ত ঘটনা বলিতে গেলে বিস্তর হইয়া উঠিবে, দুই একটা ঘটনা বলি।

"আমার যখন তত বয়স হয় নাই, তখন ছোট বালকদিগকে আশ্রয় করিয়া পাঠশালায় যাইতাম। হৃদয়ে হাত দিয়া দেখেনত বুঝিতে পারেন, পাঠশালার নামেই আমার হৃদয় কেমন কাঁপিতেছে! বালক পাঠ করিতে বসিল—আমি তাহার পার্শ্বাবলম্বন করিয়া রহিলাম। গুরু মহাশয় যাহা বলিতে লাগিলেন,—আমি তাহা বালকের মনের ভিতর পহুঁছাইয়া দিতে লাগিলাম; বালক অন্যমনস্ক হইল, অমনি ব্যবস্থা হইল, কর্ণমর্দ্দন! প্রাণপণে খাটিয়া এই পুরস্কার, সুখের আশায় কৃষ্ণ-বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াছি, ইন্দ্র-চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছি, যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু সকলেরই আশ্রয়ে পুরস্কার সেই একই!

"ইস্কুলেও পুরস্কারে রূপান্তর ঘটিল না, কেবল মাত্রান্তর ঘটিল;—সেটা আবার আধিক্যের দিকে। তখন বাবুদের একটু বয়স বাড়িয়াছে, আর তাঁহারা কেবল মনের দাস নহেন, চক্ষুও তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। অধ্যাপক পড়াইতে-

ছেন,—তাঁহাদের চক্ষু মনের সঙ্গে পাড়া বেড়াইতে গেলেন, আমার সঙ্গে দেখা হইল না। অধ্যাপক মহাশয়েয় উপদেশটী কেমন করিয়া তাহাদের নিকট পঁহুছাইব? তখন সেই মহাশয় ও অদৃষ্ট গুণে আমার পক্ষে দুরাশয় হইয়া দাড়াইলেন,—হুকুম হইল কর্ণমর্দ্দন! একেই বলে "পরাপরাধেন পরাপমানম্।"

"সংসারেও আমার বিষম বিড়ম্বনা। সুখের মুখ এ জনমে দেখিলাম না। জগতের সমস্ত পাপের জন্য যেন আমি দায়ী। চোর হাতে চুরি করিল,—"দে কাণ কেটে!" ভণ্ড মুখে ভণ্ডামি করিল,—"দে কাণ মলে!" কেন গো, কাণ কি যীশুখ্রীষ্ট নাকি, যে সকলের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করিবে?

পোড়া মনে কত সাধ হইত! একবার মনে হইল, একটা দেহ-ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া দেখি, শান্তি-সমীরণ পাই কি না। "লাভঃ পরং গোবধঃ।"—শন্তির আশায় যাইয়া অশান্তির আধার

হইয়া পড়িলাম, তখন হিতকথা শুনিলে আমার গা জ্বালা করিত, সত্য কথা শুনিলে, আমার কেমন একটা অন্তর্দ্দাহ হইত, পরের প্রশংসা হইলে ত মনে হইত, বুঝি শতধা বিদীর্ণ ই হইলাম! কতবার ফাটিতে ফাটিতে রহিয়া গিয়াছি, তাহাও বলিতে পারি না। কেন এমন হইল,—আমার এ রোগ কেন জন্মিল; ইস্কুলে মর্দ্দন যাতনা যে ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, প্রতিবেশীর উন্নতি হইল, তাতে আমার ক্ষতি কি ? সে সংবাদ বৃশ্চিকরূপে আমায় দংশন করে কেন ?—

"এই সকল ভাবিয়া বিষদুষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় দুষ্টদেহ পরিত্যাগই শ্রেয়স্কর স্থির করিলাম— "সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি।" অসৎ-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসংসর্গে থাকিয়া কয়েকটা দিন সুখে কাটাইয়া যাই,—কৃষ্ণকথা শুনিয়া, কৃষ্ণানুরাগসম্ভূত ব্রজবালকসঙ্গীত শুনিয়া, আত্মাকে চরিতার্থ করি,—আমার দেহস্থিত আকাশটুকুতে পূরিয়া রাখি—

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে
ধেনু চরাব।"

"কপালগুণে গোপাল মিলে।" আমার কপাল যে: পোড়া। তাই আমি ভক্ত খুঁজিতে যাইয়া ভণ্ড পাইলাম, রত্ন খুঁজিতে যাইয়া শুক্তি পাইলাম, মনচোরের নাম শুনিবার জন্য জুয়াচোরের আশ্রয় লইলাম। তাহাদের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া আমার কৃষ্ণ-ভক্তি উড়িয়া গেল।—

আমার দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। হরি-গুণ শ্রবণে কৃতার্থ হইব ভাবিয়া যেখানে উপস্থিত হইতাম,—সেখানেই আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। সকলেই আমার গলায় ছুরি বসাইবার জন্য অগ্রসর হইত, বলিত,—"দে, ভণ্ড বেটার কাণ কেটে দে।"—তখন আমার বাহনের শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, নামাবলি, কোন কাজে আসিল না। এই সকল দেখিয়া ভাবিলাম—"বাপুহে, তুমি যে শিখা উড়াইয়া শিখীর ন্যায় পেখম ধরিয়া বেড়াও, সেত ভাল নয়, তোমার জন্য কোন দিন আমার

সর্ব্বনাশ হইবে।"—এই ভাবিয়া প্রাণের দায়ে অস্থির, এখন কোথায় গিয়া প্রাণ রাখি বলুন দেখি ?"

পাঠক মহাশয় শুনিলেন ত, এখন আপনি কি বলিতে চাহেন ? কর্ণের দুঃখ কাহিনী যে একেবারে অমূলক, বা অতিরঞ্জিত তাহা নহে। গ্রামের ভিতরে বাহিরে উভয়ত্রই কর্ণের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ হয়। গ্রামের বাহিরে এক কর্ণের, আর গ্রামের ভিতরে দুই কর্ণের।

সুতরাং কর্ণের পরিতাপের যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। কিন্তু কর্ণের বিপদ নিবারণ করিবার কোন উপায় কল্পনা করা যায় কি না, সে বিষয়ে কখন কেহ ভাবিয়াছেন কি ? যদি নাও ভাবিয়া থাকেন, ভাবিয়া দেখিবেন।

আমরা বলি, কর্ণ অধীর হইও না ; তোমাকে মর্দ্দন করিয়া যদি অন্য কাহারও সন্তুষ্টি হয়, হউক। পরের সুখোৎপাদনই পরম ধর্ম্ম! এহেন ধর্ম্মে অবহেলা করিও না। এরূপ মর্দ্দনযাতনা সহ্য

করিয়া পরের প্রীতি উৎপাদন করিতে মহৎ না হইলে অন্য কেহই পারে না। এরূপ মহৎ যে জগতে নাই তাহা নহে। তোমাকে সেই মহতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলি। মহতের আশ্রয়ে নিশ্চয়ই লাভ আছে।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে মহত্ত্ব রক্ষা হয় না; শাস্ত্রত চুলোয়ই যায়—"ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" তুমি লোককে শাস্ত্র শুনাও,—নিজের একটু যাতনা হইল বলিয়া শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা উচিত নহে।

কর্ণের দরখাস্ত পাইলাম—তাহাতে বর্ত্তমান বাস-স্থান বা যন্ত্রণাস্থানের যে ঠিকানা আছে, তাহা বিশেষ কারণবশতঃ পাঠককে জানাইতে পারিলাম না।

পারিব না।

যাহাই বল,—তীব্রভাষী বল, আর স্পষ্ট-বাদীই বল, দুর্ম্মুখই বল, আর নির্ভীকই বল, সমালোচকই বল, আর ছিদ্রান্বেষীই বল, যা ইচ্ছা বল না কেন, যাহা বুঝি, তাহার বিপরীত লোকের নিকট বলিতে পারিব না; যাহা ভাবি, তাহার বিপরীত লোককে বুঝাইতে পারিব না; যাহা করি, তাহার অতিরিক্ত লোককে দেখাইতে পারিব না।

ঐ যে ত্রিপুণ্ড্রধারী পুরুষটী নানা স্থান পর্য্য-

টন করিয়া বেড়াইতেছেন, যাঁহার কটিদেশ কষায় বস্ত্রে আবৃত, শিরোদেশ শিখা দ্বারা সমলঙ্কৃত, শরীর গৈরিকরক্ত উত্তরীয়ে সমাচ্ছাদিত, হস্ত চারুদণ্ডে সুশোভিত,—তাঁহাকে দেখিলে তোমার কি মনে হয়?

তুমি ভাব,—ইনি ভগবদ্‌গতহৃদয়, সংসারাসক্তি-শূন্য, ভোগলালসাবিবর্জ্জিত। সংসারে আসক্তি নাই তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন,—ভোগে লালসা নাই, তাই গৈরিকরক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, ভগবদ্‌গত হৃদয়, তাই নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন।

তুমি সরল-হৃদয়, বাহ্য চাক্‌চিক্যের মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে? যদি তোমার অন্তর্দৃষ্টি থাকিত, তবে তুমি বুঝিতে পারিতে,—শূর্পণখার মায়া-কল্পিত রূপরাশির ভিতর রাক্ষসী মূর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, মনোহর কুসুমের অভ্যন্তরে ভুজঙ্গ লীন রহি-য়াছে, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসিদেহে দশানন বিরাজ করিতেছে।

তুমি যদি তত্ত্বজ্ঞ হইতে, তাহা হইলে, হয়ত এই ত্রিপুণ্ড্রধারী পর্য্যটনকারীকে, কষায়ারুণ-বস্ত্রাবৃত পর্য্যটক-প্রবরকে দেখিলেই বলিয়া ফেলিতে,—

দিবোপবাসী নিশি চামিষাশী
"টিকী"-ধরঃ সন্ কুলটাভিলাষী
স্বয়ং কষায়ারুণ-চারু-দণ্ডঃ
শঠাগ্রণীঃ সর্পতি বিশ্বভণ্ডঃ।

আমরা নাকি সংসারের তত্ত্বজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, ভাবজ্ঞ, তাই সিংহচর্ম্মাচ্ছন্ন রাসভকে সিংহ বলিতে পারি না, ময়ূরপুচ্ছাচ্ছন্ন বায়সকে ময়ূর বলিতে পারি না; শিখা-ত্রিপুণ্ড্রধারী বিশ্বভণ্ডকে, সাধুরূপে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে পারি না; যত কাল শরীরে আর্য্য শোণিত বিকৃতি প্রাপ্ত না হইবে, তত কাল পারিবও না।

ঐ যে নরপুঙ্গব বিপুল দেহভারে ধরাভার বৃদ্ধি করিতেছেন,—জন-সম্পদ বা ধন-সম্পদের গৌরবে ধরাখানাকে শরা ভাবিতেছেন, জ্ঞানে আপনাকে বৃহস্পতি মনে করিতেছেন,—নিজের বৃহস্পতিত্ব প্রখ্যাপন মানসে সঙ্গোপনে কল্পতরু

সাজিতেছেন—দেখিতেছ কি? সেই কল্পতরুর ছায়ায় বসিয়া কত লোক তাঁহার যশোগীতি দ্বারা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে বুঝিতেছ কি? গোল করিও না, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, স্তুতির ভাবটা হৃদয়ঙ্গম কর, মানুষের মুখে মানুষের স্তব আর বেশি সম্ভব কি না, একবার ভাবিয়া দেখ।

উক্ত নরপুঙ্গবের প্রশংসা করিতে গিয়া কৃতজ্ঞ-গণ বৃহস্পতিকে মূর্খ বলিতেছে, বাল্মীকি ও বেদ-ব্যাসকে কবির আসন হইতে দূরীকৃত করিতেছে, জনকপ্রভৃতি জ্ঞানীর আসনে বসাইয়াও তাহাদের অভীষ্টদেবের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হইতেছে না!

তুমি ভাল বল আর মন্দই বল, আমি স্পষ্টই বলিতেছি,—আমি এরূপ স্তব জানি না,—করিতেও পারিব না। লৌহপাত্রে কলাই করা, পিত্তলে গিল্‌টী করা, কেমিকেল স্বর্ণ প্রস্তুত করা, আমার ব্যবসায় নহে,—আমাকে ও অনুরোধটি করিও না, —আমি তাহা পারিব না। যাহাকে নিষ্ঠুর ভাবি, তাহাকে দয়ালু কেমন করিয়া বলিব, যাহাকে

পাষণ্ড ভাবি, তাহাকে ধার্ম্মিক কেমন করিয়া বলিব, যাহাকে নরঘাতক ভাবি, তাহাকে অহিংসা-নিরত কিরূপে বলিব? যাহার প্রতিলোমকূপ হইতে কণিকচাণক্যের কূটনীতির বিকাশ পাইতেছে, তাহাকেও কি জনক বা শুকদেব বলিতে হইবে? তাই বলিতেছি,—সেটী পারিব না।

শাস্ত্রে যাহার পল্লবগ্রাহিতা দেখিয়া নাম করিতে লজ্জিত হই, লেখায় যাহার তরলতা দেখিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, স্বভাবে যাহার চাপল্য দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়—তাহাকে কেমন করিয়া শাস্ত্রে পারদর্শী বলিব? অর্থগৌরবে ভারবির আসনে বসাইব? স্বভাব-স্থৈর্য্যে যুধিষ্ঠিরের সহিত তুলনা করিব? আমায় ক্ষমা কর,—তাহা আমি পারিব না।

আমিত কাকের ধ্বনিকে কোকিলের কাকলি বলিতে পারিব না, ঝিল্লীরবে ভ্রমর গুঞ্জন অনুভব করিতে পারিব না, বিষধরের দেহ-লতাকে মৃণাল-হার বলিতে পারিব না;—এ যদি অপরাধ হয়,

হউক, আমি অনন্তকাল এ অপরাধে অপরাধী থাকিতে সম্মত আছি।

ঐ দেখ, একব্যক্তি নিজের স্বার্থসাধনমানসে বালকবৃন্দের হস্তে বিষদিগ্ধ মোদক দান করিতেছে; শত শত লোক এরূপ অমানুষিক ব্যাপারে স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না, কি বলিবে বুঝিতে পারিতেছে না। সেই পণ্ডিতের নারকীয় অনুচরগণ মোদকের প্রশংসা করিতেছে, মোদক ভক্ষণ করিলে বালকগণ অপূর্ব্ব জ্ঞান-জ্যোতিঃ লাভ করিবে বলিয়া প্রলোভন জন্মাইতেছে। হায়! বালকগণ যদি জানিত যে এ মোদক ভক্ষণ করিলে তাহাদের জ্ঞান তিরোহিত হইবে, নয়নযুগল অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইবে, বঞ্চকগণের প্রতারণায় তাহারা চিরকালের মত মনুষ্যজীবন হারাইবে, তাহা হইলে তাহারা এ মোদক গ্রহণ করিত না। এ অমানুষিক কাণ্ড দেখিয়া, এ নারকীয় অভিনয় দেখিয়া, এ নৃশংস

ব্যাপার দেখিয়া যাঁহারা নির্ব্বাক্ থাকিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য! যাঁহারা পাষণ্ডের নারকীয় অভিলাষ পূরণে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা আরও ধন্য! আমরা ধন্যবাদ চাই না,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে পারিব না।

সময় বড়ই বিষম পড়িয়াছে;—তোমার চক্ষুর সম্মুখে শত শত নরনারী অন্নাভাবে করাল কাল-কবলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, তুমি তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করিতেছ না, সে তুমিও রাজোপাধি ভূষিত, সে তুমিও প্রজাপালক, সে তোমারও প্রশংসা করিতে হইবে? তুমি বিচারক,—শাক চুরি করিলে তুমি শূলের ব্যবস্থা কর,—তোমার সহচরগণ সমাজের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, প্রকারান্তরে সাহায্য করিতেছ, সেই তোমারও প্রশংসা করিতে হইবে, —বল দেখি কেমন করিয়া পারি? তাই বলি, পারিব না, পারিব না।

ব্রজাঙ্গনার বিবাহ।

একটা কন্যাদায়ে লোক অস্থির হয়,—আর আমাদের ঘাড়ে এতগুলি! নিজেরও কম নহে, তার উপর আবার বন্ধুবান্ধবের কতকগুলি! তাই আমি ব্যাকুল হইয়া ঘটক মহাশয়দের শরণ লইয়াছিলাম; তাঁহারাও কয়েকটী বর আনিয়া ছিলেন, পছন্দ হইল না বলিয়া অন্য বর খুঁজিতে বলি। কিন্তু তাঁহারা অদ্যাপি অন্য কোন বরের সংবাদ দিলেন না। আমি নিজেই একটি স্থির করিয়াছি —যদি কাহারও অনুসন্ধানে কন্যার উপযুক্ততর

কোন বর থাকে, তাহার কথা অবিলম্বে জানাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। কন্যাটীর রূপ গুণের পরিচয় পাঠককে একটু দিয়া রাখি,—

তাহার নাম "ব্রজাঙ্গনা" জন্ম দত্তবংশে। দেখিতে পরম সুন্দরী। লেখা পড়া বেশ শিখিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। যদিও তাহার পিতা শিশুকালে "পাদ্রিণীর" হাতে এবং একটু বড় হইলে "ব্রাহ্মিকার" হাতে তাহার শিক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার সেই অকৃত্রিম হিন্দুভাবটুকু আজিও নষ্ট হয় নাই। খ্রীষ্ট-প্রেম-ভিখারিণী পাদ্রিণী আমাদের ব্রজাঙ্গনার কৃষ্ণ-প্রেম-নাশিনী হইতে পারে নাই, ব্রহ্মবাদিনী ব্রাহ্মিকার ব্রহ্মমন্ত্রের প্রহেলিকা ব্রজাঙ্গনার ব্রজেশ্বর-প্রেমে কুহেলিকার সঞ্চার করিতে পারে নাই;—তাহার কৃষ্ণ-ভক্তির একটানা স্রোতঃ পদ্মার স্রোতের মত অবিরাম গতিতে সেই অনন্ত প্রশান্ত কৃষ্ণ-প্রেম-মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাতে জোয়ার ভাঁটা নাই; সুতরাং ব্রজাঙ্গনার ব্রজেশ্বরগত হৃদয়ে

কখনও খ্রীষ্ট-প্রেম, বা ব্রাহ্ম-প্রেমের আগমন নির্গমন সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

ব্রজাঙ্গনা প্রিয়বাদিনী, মধুরভাষিণী, কখনও কর্কশ কথা মুখে আনে না; কথায় কথায় অমৃত-মাধুরী,—বিনয়মাধুরী, কৃষ্ণভক্তি-মাধুরীতে শ্রোতৃ-বর্গের হৃদয় মুগ্ধ করে, মনঃপ্রাণ আকুল করে, কি যেন হারাণ নিধি হাতে তুলিয়া দেয়, কি যেন লুকায়িত ভাব, কি যেন কি—তাহাদের অন্তরে জাগাইয়া দেয়।

ব্রজাঙ্গনার বড় ভাইটীকে বোধ হয় পাঠক মহাশয় চিনেন; তাহার বীরত্ব, বঙ্গদেশে অবিদিত নাই; নাম করিলেই পরিচয়ের বাকী থাকে না, —তাহার নাম "মেঘনাদ"। তাহার পিতা কন্যা-টিকে বড়ই ভাল বাসিতেন; এমন কি বীরপুত্র মেঘনাদ অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর সময় মেঘনাদের উপর কন্যার বিবাহভার না দিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভাই, আমার কন্যা-টীর ভার তোমার উপর রহিল, তাহাকে একটী

সুপাত্রে অর্পণ করিও। মেঘনাদের জন্য ভাবিও না; সে বীর। যোড়াসাঁকোর নর্দ্দামায় ডুবিলেও তাহার অপমান নাই; দেখিও, আমার কোমলতা-ময়ী লতাটী যেন কণ্টকাবৃত কোন তরুতে আশ্রয় না করে, আমার সুরভি কুসুমটী যেন দেব পূজায় ব্যবহৃত হয়, আমার এই সিন্দুরে আমটী যেন দাঁড়কাকের বিলাস সামগ্রী না হয়।"

আমার মাথায় স্বর্গগত বন্ধু এই বিষম ভার চাপাইয়া গিয়াছেন। বরের বাজার যেরূপ চড়া তাহা মহাশয়দের অবিদিত নাই। সুপাত্র ত যোটে না, যুটিলেও ভারি দাম!—দামের ভাবনা পরে এখন যুটিলেই বাঁচি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাশয়দের আনীত কয়েক জন বরকে বাতিল করিয়াছি, তাহাদের কথা আমার নিকট কেহ উপস্থিত না করেন, সেইজন্য যে কারণে যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

প্রথম—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। জাতিতে ব্রাহ্মণ

হউক, অনুলোম বিবাহে আপত্তি নাই, এখানে প্রাচীন মুনিদের মতে চলিতে আমি রাজি আছি। কিন্তু বর দেখিয়া পছন্দ হইল না। বর দেখিতে কুৎসিত, মাথায় টিকীও নাই টেরিও নাই। গোঁপ যেন গোঁপ নয়,—যেন পাশাপাশি দুই গাছি ঝাঁটা সাজান। এই ত গেল রূপ; গুণ একটু শুনুন,—ঘটক মহাশয় বলিয়াছেন বর নাকি একজন মস্ত কবি! হোমর, বর্জ্জিল, বাল্মীক, বেদব্যাস, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, নাকি এই কবি হজম করিয়াছে! ইহা কালাচাঁদ ঘটকের নিজের চক্ষের দেখা! তিনি নাকি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

আমি বলিলাম, ঘটক মহাশয় আপনার বরের দুই একটী কবিতা শুনাইতে পারেন কি? তখন ঘটক মহাশয় বগল হইতে অতি জীর্ণ এক খাতা বাহির করিয়া পড়িলেন।

"এত শুনি বচন বলেন বীরহনু।
আগুীর পাথর বাজী আগে পাকতনু॥"

"চমৎকার ভাব!" বলিয়া আর একটু পড়িলেন,—

"জোড়া শিঙ্গা ফোঁকে কালু বলে মার মার।
শুনিয়া ইছাই ঘোষে লাগে চমৎকার।"

শুনিয়া আমি বলিলাম, আপনার শিঙ্গা ফোঁকা হোমর বর্জ্জিল লইয়া আপনি থাকুন; আমি পরের মেয়ে এই বরে সমর্পণ করিতে পারিব না। আমার ব্রজাঙ্গনা—যমুনা পুলিনে, নিকুঞ্জ বনে, তমসাচ্ছন্ন তমালকাননে একাকিনী ভ্রমণ করিতে সাহস করিলেও—আপনার হোমরের —বিরল কবি ঘনরামের,—"আণ্ডীর পাখর বাজী" শুনিলে চমকিয়া উঠিবে। অন্য বর দেখুন। কালাচাঁদ ম্লান মুখে চলিয়া গেলেন।

রামহরি ঘটক নিকটে ছিলেন;—তিনি বলি-লেন, বটে, ভাল বর চাই? আমি দিচ্ছি, কিন্তু টাকা দশটী হাজার!

দশ হাজার টাকা শুনিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইল! কিন্তু তথাপি হোমর বর্জ্জিলের পরে দশ হাজার টাকার বরটী দেখিতে একটু ইচ্ছা হইল।

বলিলাম আগেত বর আনুন, তাহার পর টাকার কথা। "তাহা বটে" বলিয়া ঘটক বিদায় হইলেন।

পর দিন প্রাতে ঘটক বর লইয়া উপস্থিত হইলেন;—বরটী দেখিতে কেমন?—

"বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল
ঈষৎ গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে,
ভ্রমর পাঁতির দেখা॥

* * * *

আজানু লম্বিত বাহু সুললিত,
কামের কনক আশা।
রসের আলয় কপাট হৃদয়,
ফণি মণি পরকাশা॥"

গুণের পরিচয় অনাবশ্যক,—ইহাঁকে দেখিয়াই বোধ হয় কবি বলিয়া ছিলেন,—

"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।"

শুনিলাম বর রাজসভার কবি। আমি এই বরের আশায় নিরাশ হইয়া ভাবিলাম, বরের দাম দশ হাজার হওয়া অসম্ভব নয়, সুতরাং কাঙ্গালের

ভাগ্যে এ বর যুটিবে না। "পরে যাহা হয় বলিব" বলিয়া ঘটকে বিদায় করিলাম।

পর দিন আবার কালাচাঁদ ঘটক উপস্থিত; এবার তিনটী বরের নাম করিলেন—হেম, নবীন, রবি, তিনটীই নাকি কবি। বর দেখিতে যাওয়ার দিন স্থির হইল;—কেবল তাই কেন, সবই স্থির হইল, যে বর দেখিয়া পছন্দ হইবে, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।

প্রথম হেমের বাড়ী যাওয়া গেল। প্রকাণ্ড বাড়ী, দাস দাসীর অভাব নাই। আদর অভ্যর্থনার কোন অংশে ক্রটী হইল না। শেষ বর দেখা দিলেন। দস্তুর আছে বরকে একটা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আর শুনিয়াছি বর কবি,—তাই আমি বলিলাম,—"বাপু শুনিয়াছি তুমি সুকবি। 'শিশুর হাসি'—বিষয়ে একটু লিখ দেখি।"—বর লিখিল,—

কি মধু মাখান, বিধি, হাসিটী অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে,

* * * * *

নবনীর সর ছাঁকা, সুন্দর শরত রাকা
তরুণ প্রভাত কিহে, কোমল এখন?

বর যে সুকবি সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই কবিতাটী দেখিয়াও আমার এ ধারণা বেশ হইল। কিন্তু এই বরে কন্যা সমর্পণ করিতে নানা কারণে আমার মন উঠিল না।

প্রথমে দেখুন,—ব্রজাঙ্গনা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কখনও কখনও তার নবনী বা সর খাওয়া সম্ভব। "নবনীর সর" খাওয়া দূরে যাউক, চক্ষেও বোধ হয় দেখে নাই। কবির ঘরের "নবনীর সর" সে হয় ত চিনিতেই পারিবে না। নবনীর সর অর্থাৎ নূতন জলের সর এরূপ অর্থ করিয়া যদি ব্রজাঙ্গনা জলের সর খুঁজিতে যায়, তবে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়াও অসম্ভব নয়। এই জন্য এ বর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

পরে ঘটক মহাশয়ের সঙ্গে নবীন কবির বাড়ী যাওয়া গেল। তাহাকেও একটী কবিতা লিখিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, লিখিব কি? আমার

পুস্তক দেখেন নাই;—তখন ঘটক মহাশয় চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া আমাকে বলিলেন,—আপনি জানেন না, ইনি যে প্রেম রসের অবতার! ইহাঁকে আবার লিখিতে হইবে কেন? ইহাঁর একটী প্রণয়রসসিক্ত কবিতা আমি বলছি শুন্থুন—

"সামান্য সঙ্গীতে হায়।

কেড়ে লয় হরিণীর	কণ্ঠ হার, করে নীর
নিরেট পাষাণ যদি,	তবে কি বিস্ময়
যথা প্রেমযন্ত্র,	যন্ত্রী মানব হৃদয়!"

কবিতা শুনিয়াই ত আমি অজ্ঞান! এ কবিতা বোঝা আমার কর্ম্ম নয়। ব্রজাঙ্গনাকে এ নিরেট পাষাণে আছড়াইয়া মারি কেন? এই ভাবিয়া বলিলাম "চলুন ঘটক মহাশয়, এখন উদীয়মান কবি রবির কাছে যাই।" ঘটক রবির কবিতার পঞ্চ বক্তে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উদয়াচলে উপস্থিত হইয়াও আমার সেই একই কথা। বাপু একটী কবিতা লিখ দেখি। বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কয়েক খানি বই বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জ্জর,
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
সকলের কাছে কেন যাচিগো নির্ভর,
গৃহ নাই গৃহ নাই মোর গৃহ নাই।"

বুঝিলাম এটী পদ্য, বর কণ্টক, নিজের কণ্টকে নিজেই জর্জ্জর, আমি নিষ্কণ্টকে মেয়েটী দিব কি বলে? মেয়ের বাপত আমায় স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—দেখিও আমার কোমলতাময়ী যেন কণ্টক-বৃক্ষ আশ্রয় না করে।"

বর আর এক স্থলে পড়িলেন,—

"বারেক ভালবেসে যে জন মজে
দেবতা সম সেই ধন্য—
দ্বিতীয় বার পুন প্রেমে যে পড়ে
মূর্খের অগ্রগণ্য।
আমিও সে দলের মূর্খরাজ—"

"এই নাও বাবা! এইবার কবুল জবাব! এখন চল।" বলিয়া ঘটককে লইয়া বিদায় লইলাম।

পাঠক এখন ভাবুন, কন্যাদায়গ্রস্ত বরান্বেষণে বহির্গত হইয়া যখন নিরাশহৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন তাহার মনের ভাবটী কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা

একবার চিন্তা করুন। আমি হতাশহৃদয়ে শূন্য-মনে বাড়ী ফিরিলাম। আমার মাথায় যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তখন কুসুমকাননের দিকে একটী অপূর্ব্ব গীত শুনিতে পাইলাম—

"এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে, পরে ছিল কুতুহলে,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া,
এ উজ্জ্বল মণি,
মোর কৃষ্ণচূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?"

কে গায়! এ মধুর স্বর-লহরী কাহার? কে আমার দগ্ধ প্রাণে, হতাশ হৃদয়ে অমৃত-ধারা ঢালিল? কে আমার চিন্তাসন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিল? অনুসন্ধানে দেখিলাম,—আমাদের সেই ব্রজাঙ্গনা! মাথায় কৃষ্ণচূড়া ফুলের চূড়া বাঁধিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতেছে—

"যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জ বন,

না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
সুধাংশু সুধার হেতু বান্ধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মন যথা উঠে গো গগনে,—
হেরিতে মুরলীধর—রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি [illegible] অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন!"

গানটী শুনিয়া মনে করিলাম,—মাগো! আমি তোমাকে চিনি নাই, তাই তোমার বর খুজিয়া পাই নাই। তুমি হরিভক্তি পরায়ণা, হরি-গত-প্রাণ না হইলে তোমার বর হইতে পারে না। তুমি যমুনা-পুলিনে নিকুঞ্জ-বনে, ব্রজের রঞ্জনকে অনুসন্ধান করিয়া, বেড়াইতেছ, পাইতেছ না; যে ব্যক্তি তাঁহাকে খুঁজিয়া দিতে পারিবে, সেই তোমার মনোরঞ্জনে সমর্থ,—সেই তোমার পাণি-গ্রহণের উপযুক্ত।

তখন সুমন্দ মলয়ানিলসমানীত অমৃতনিষ্যন্দিনী স্বর-লহরী কর্ণে প্রবেশ করিল! শুনিলাম;—

"ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে,
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।

* * * * *

"স্ফুরদতিমুক্তলতা-পরিরম্ভণ-মুকুলিত-পুলকিত-চূতে,
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনা-জল-পূতে।"

কেও, এ গীত গায় কে? এই না আমাদের ব্রজাঙ্গনার মানসরঞ্জন ব্রজেশ্বরের অনুসন্ধান বলিয়া দিতেছে, যমুনাতীরে ভ্রমর-গুঞ্জিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে হরির বিহারের কথা প্রকাশ করিতেছে? চলত পাঠক দেখিয়া আসি, লোকটা কে?—

* * * *

শাঁখ বাজাও গো! ব্রজাঙ্গনার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে। যিনি গীত গাহিয়া গোবিন্দের অনুসন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, তিনিই ব্রজাঙ্গনার বর—নাম গীতগোবিন্দ। বরের পিতার নাম জয়দেব গোস্বামী।